## প্রথম অধ্যায়

# ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার কবি ও কবিতা

কোনও সন্দেহ নেই যে লুইত পারের[১] প্রথম প্রকাশিত কবিতাগ্রন্থের কবি অমলেন্দু গুহ[২]। কলকাতায় ছাত্র থাকাকালীন কবিতা লিখলেও বা কলকাতার প্রকাশকের দ্বারা প্রকাশিত হলেও অমলেন্দু কিন্তু কখনও তাঁর শিকড়কে ভুলে যাননি। অধিকাংশ কবিতায় অসমের সংস্কৃতি-পরিবেশ-প্রকৃতি ফুটে উঠেছে। এইসঙ্গে যুক্ত হয়েছে এই কবির বামপন্থী মনন। বইটির নামের মধ্যেও জড়িয়ে রয়েছে অসমের এক প্রধান নদীর নাম। লুইত শব্দের অর্থ ব্রহ্মপুত্র। নামকবিতায় পাওয়া যাচ্ছে লুইত[৩], শিপিনী[৪], রিহামেখলা[৫], বহাগী[৬], নাহর[৭], ভৈয়াম[৮], কপৌ[৯]-এর মতো শব্দ। এসবের মানে-সাধারণ বাঙালি পাঠকের বোঝার কথা নয়। কিন্তু অমলেন্দু এইসব ব্যবহার করেছেন একেবারে জলবৎ তরলং ঢঙে। এ-প্রসঙ্গে মনে পড়ছে বিষ্ণু দে[১০]-র কবিতা। ফরাসি ভাষায় প্রাজ্ঞ জ্ঞানপীঠ জয়ী বিষ্ণু দে ইচ্ছেমতো যেখানে-সেখানে ফরাসি শব্দ ব্যবহার করেছেন। অনেক ক্ষেত্রেই যার অর্থ তিনি বলে দেননি। কমলকুমার[১১] তো গোটা একটি ফরাসি কবিতাই রেখেছিলেন এক লেখাতে। এবং একটুও আশ্চর্যের নয় যে তিনি তার অর্থ বলেননি।

প্রকৃতপক্ষে অমলেন্দু প্রথম থেকেই লুইত পারের গন্ধ-রস-সংস্কৃতি শুষে নিয়েছেন, তাঁর কবিতা পড়লেই বোঝা যায় এই কবি কোন অঞ্চলের।

এখানে স্বপ্নের মতো আমার সত্তার সাথে

জড়ানো, ছড়ানো এক দেশ—

আমি ভালোবাসি তার বনরাজিনীল পরিবেশ।

... ... ...

কমলার কুঞ্জে কুঞ্জে রসলুব্ধ মৌমাছির ভিড়

... ... ...

কখনও-বা প্রথম বৈশাখে

শিপিনী কুমারী সাজে আনকোরা রিহামেখলায় (লুইত পারের গাথা) (উত্তর পূর্বের বাঙলা কবিতা, পৃ. ৪২)

স্বপ্নের মতো সত্তার সঙ্গে জড়িয়ে, ছড়িয়ে থাকে বনরাজিনীল লুইত পারের পরিবেশ।

অসম-মগ্ন কবি অমলেন্দু ধীরে ধীরে বুনে চলেন তাঁর গাথা। কমলার রসের মতো রোদ চুঁইয়ে পড়ে এরকম লেখেন কলকাতাবাসী লেখক। জীবনানন্দ[১২] 'কমলা কোয়ার মতো'[১৩] পর্যন্ত লিখেছিলেন। আর লুইত পারের কবি অমলেন্দু 'কমলার কুঞ্জে কুঞ্জে'[১৪] লিখে নিজের অভিজ্ঞতাসঞ্জাত অনুভূতিই জাগিয়ে তোলেন। পশ্চিমবঙ্গের নববর্ষ বহুল প্রচলিত এক প্রাকৃতিক উৎসব। ব্রহ্মপুত্র পারে ওই সময়ই অসমের প্রধান উৎসব, এই উৎসবও প্রাকৃতিক, পালন করা হয়। স্থানীয় নাম বিহু[১৫]। ১ বৈশাখ বাংলার মতো অসমিয়াতেও নববর্ষ। নববর্ষে নতুন বস্ত্র পরার বিষয়টি রয়েছে— আনকোরা রিহামেখলায়[১৬]। একটু পরেই এই কবিতায় পাওয়া যায় 'বহাগীর আমন্ত্রণ'[১৭], 'কলঙের জলোচ্ছ্বাস'[১৮], 'জুমখেত'[১৯], 'ভৈয়ামের ভিজে মাটি'[২০], 'লুইতের গতিবেগ'[২১] প্রভৃতি শব্দ। আর অমলেন্দু নিজের অবস্থান চূড়ান্ত করে দেন 'শান্তির নিবিড় নীড় আমার আসাম'[২২] লিখে।

তখনকার ধারা অনুযায়ী অমলেন্দুর অধিকাংশ কবিতাই মাত্রাতিরিক্ত দীর্ঘ। এই লুইত পারের গাথা কবিতাটিরই এক অংশে তাঁর বামপন্থী মননের চিহ্ন স্পষ্ট। যখন তিনি লেখেন—

প্রতিবেশী চীনদেশে দল বেঁধে চাষি ও মজুর

প্রচার করেছে এক মধুর ফতোয়া

কিংবা—

আমার অসমে

একটি শপথ আজ ঠোঁটে ঠোঁটে নড়ে ওঠে

গ্রামে-বনে-পাহাড়ে-ভৈয়ামে

দেবে জান তবু মান দেবে না কিষান,

...বাতাসে উড়িয়ে দেবে বাধার নিশান।

ভারতের যে কোনও গ্রামের একটি পরিচিত দৃশ্য ঢেঁকিতে মেয়েদের ধান ভানা[২৩]। 'ফার্স্ট লাভ'[২৪] চলচ্চিত্রে এরকম একটি দৃশ্য দেখে তো নায়কের যৌনতাই চাগাড় দিয়ে ওঠে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মূল অধিবাসীদের শরীরের গড়ন মঙ্গোলিয়ানদের মতো। সুনীতিকুমার এটা আমাদের জানিয়েছেন। এই অঞ্চলের মেয়েরা তুলনামূলকভাবে বিভিন্ন কাজে শরীরকে খাটায় বেশি। পূর্বোত্তরের সাধারণ একটি মেয়ের শরীরের গঠন বলিষ্ঠ— এটাই পরিচিত দৃশ্য। আর কবিরা তো সন্ধ্যাভাষায় বাস্তবই লিখে রাখেন। অমলেন্দুর অনুসন্ধানী দৃষ্টি খুঁজে নিতে ভুল করেনি যে 'দৃঢ়ঊরু মেয়েদের পদপাতে নেচে ওঠে ঢেঁকি'[২৫]। এই পঙ্‌ক্তি দিয়ে শুরু হচ্ছে 'বিহু' কবিতাটি। এক লহমায় মনে আসে, ঢেঁকিতে ধান যখন গুঁড়ো করা হচ্ছে নিশ্চয় এটা ভোগালি বিহু[২৬]। যদিও এই কবিতাতেই পরে কবি কপৌ ফুলের প্রসঙ্গ এনেছেন। যা কি না বহাগ বিহুর[২৭] অনুষঙ্গ।

সদ্য প্রয়াত বীরেন্দ্রনাথ[২৮] জন্মেছেন অমলেন্দুর ১০ বছর পরে এখনকার বাংলাদেশের রাজশাহিতে। পড়াশোনা পশ্চিমবঙ্গে। চাকরিসূত্রে তিনি শিলং ও পরে গুয়াহাটিতে এসেছেন। কোনও কোনও কবি নিভৃতে বসে কাব্যচর্চা করেন এবং মহাকাল প্রমাণ করে তাঁর শক্তি। কাব্য আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বা বিশেষ কোনও পত্রিকা গোষ্ঠীর সঙ্গে মিশে অনেক দুর্বল কবিই সম-সময়ে বিখ্যাত হয়ে যান। যথারীতি

ভবিষ্যৎ তাঁদের মনে রাখে না। মিথ্যেবাদী ছাড়া এখন আর কেউ সুধীন্দ্রনাথ[২৯], যতীন্দ্রনাথ[৩০], মোহিতলাল[৩১] পড়ে না। কল্লোলের[৩২] কবিদের কথা বাদ দিলেও দেখা যায়, কৃত্তিবাসের[৩৩] অধিকাংশ কবিই এখন অপাঠ্য। হাংরি আন্দোলনের[৩৪] পুরোধা মলয় রায়চৌধুরী[৩৫] তখন, ১৯৬২-৬৪[৩৬], কবিতা লিখেই শোরগোল ফেলে দিয়েছিলেন, এখন লম্বা-চওড়া গদ্য লিখেই তাঁর আনন্দ।

অথচ শঙ্খ ঘোষ[৩৭], অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের[৩৮] মতো কবিরা নিভৃতে কবিতা লিখেও কালস্রোতে হারিয়ে যাননি, যাবেন না। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিতকে এই স্তরে রাখা যায়।

জীবনানন্দের আট বছর আগের একদিন[৩৯] বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা আর বীরেন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে তা 'তিনশো বছর আগে'[৪০]। যেখানে রয়েছে—

বিকেল চারটে বেজে তিন সেকেন্ড, হঠাৎ কোকিল

উঠল ডেকে। আর,

বালতি-বালতি জল তোলা হচ্ছিল কুয়ো থেকে

দুঃখবেলার।

এই কবিতায় কবি ঘটনা বর্ণনা করেছেন নিজস্ব ভাষায়। কোকিলডাকা বিকেলে দুঃখবেলার (আহাঃ কী মধুর) জল তোলা হচ্ছিল কুয়ো থেকে। তখন বিকেল চারটে বেজে তিন সেকেন্ড। 'অ্যালার্ম উঠেছে বেজে জল তোলা হচ্ছে যখন...' এই কবিতা শেষ হয় '...অমনি তাকে ডেকেছিল নাকি/জলের ভিতর, বাংলাদেশে?' এসে। আর এই শেষ পঙ্‌ক্তি দিয়ে শুরু হয় 'চিঠি'[৪১]। 'চেরাপুঞ্জি[৪২] থেকে ভাষা শিলং[৪৩]— অবিশ্বাস্য আঁচলের খুঁটে/পাঠাও যে মেঘে, তার পাঁচ হাজার ফুট নিচে—জল/পড়ে-আছে বাংলাভাষায়।' (এই আলো হাওয়া রৌদ্রে, পৃ. ২১)

তিনশো বছর আগে কবিতায় বাংলাদেশের প্রয়োগ হয়তো নিরুদ্দেশ বোঝাতে আর চিঠিতে এসে তা পৌঁছেছে বাংলাভাষায়। আচ্ছা, এই মেঘই বাংলাভাষা? যা বহন করছেন প্রায় ৩০ কোটি মানুষ। এমনই ব্যাপক তার প্রসারশীলতা।

'উঠছে পাইনবন গুনগুনিয়ে[৪৪] ; রডোডেনড্রন—[৪৫]' শোনা যাচ্ছে দন্ত্য ন। 'স্মৃত-বিস্মৃত-রক্তিম'[৪৬] বেজে উঠছে শব্দশরীর। 'টাটকা', ঠিক পড়লাম তো—টাটকা? আগের পঙ্‌ক্তিতেই 'স্মৃত-বিস্মৃত'-র মতো মারাত্মক দুটো ভুলিয়ে দেওয়া শব্দ রয়েছে। এবং ঠিকই লিখেছেন বীরেন্দ্রনাথ কেননা বাংলাভাষার মেঘ ওই তাজা ভাষায় ঠিকানা লিখে কুশল জানায় সেই বাংলাভাষায় পড়ে থাকা মেঘকেই।

স্বাধীনতা উত্তর কালে অমলেন্দু গুহ একা যে ধারার মশাল বয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন, তার সার্থক উত্তরসূরি হলেন ঊর্ধ্বেন্দু দাশ[৪৭]। ষাটের দশকে উজান অসম[৪৮] থেকে দুটি ছোট পত্রিকার সম্পাদনা করেছেন তিনি। 'সংবর্ত'[৪৯] ও 'মজলিস'[৫০]-এ বহু তরুণ কবির প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। বস্তুত ঊর্ধ্বেন্দুকে ঘিরেই ওইসময় ডিব্রুগড় ও তৎসংলগ্ন এলাকায় উত্তর-পূর্বের বাংলা কবিতা-গল্প-প্রবন্ধ গতি পেয়েছিল।

অধুনা বাংলাদেশে জন্মালেও ঊর্ধ্বেন্দুর পড়াশোনা এদেশেই। অসমে যাঁরা এতদিন ধরে কবিতা লিখেছেন, ঊর্ধ্বেন্দু অন্যতম সেরা। অন্তত তাঁর কালের নিরিখে সবচেয়ে শক্তিমান তো বটেই। 'বিষণ্ণ পরবাস,

নির্বাসন নয়'[৫১], 'ঘরে তার ফেরা বা না-ফেরা'[৫২] ও 'এই লজ্জা তোমার আমার'[৫৩] কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে তাঁর। চুম্বকে ঊর্ধ্বেন্দুকে ধরতে হলে বলা যায়, সমাজমনস্ক কবি নানাসময়ে জীবনের নানা অনুভবের কথা লিখেছেন। ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ, বস্তুনিষ্ঠ মানসিকতা বা সমাজের ওপর ক্ষুব্ধ বিক্ষোভ দেখা যায় তাঁর কবিতায়। আর নাগরিক জীবনের অবিসংবাদিত ক্লান্তি কবিকে করেছে একাকী অন্ধকারের যাত্রী।

ভৌতিক প্রতীক্ষার নিরঙ্কুশ অবশেষে, মৃত্যুর চেয়েও স্তব্ধ, হিম
চৈতন্যের উদীচিতে দেখা দেবে রক্তিম প্রভাত

(ক্রান্তিকাল)

উজান অসমের বর্ণময় প্রাকৃতিক পরিবেশ কবির জীবনে এক গাঢ় তন্ময়তা এনেছে। তাঁর কবিতায় পাই—

অর্কিডের ভ্রূবলয়ে সারারাত জমতে থাকে অশ্রু কিংবা শিশিরের ভ্রম,
বনপথে ঝরাপাতা, শিমুলের ডিম ফেটে তুলোর উড়াল,
দূর তাঙাম্ বস্তিতে
পোনাঙ নাচের শেষে আদিম যুবতীরা জ্বলে রাশেঙের অন্ধকারে ওমে।

(অরুণাচলে ভোর)

অধ্যাপক কবির পড়াশোনা প্রচুর। জীবনানন্দের 'আবার আসিব ফিরে'[৫৪]-র পাশাপাশি পঙ্‌ক্তি তিনি রচনা করেন—

আবার আসবো ফিরে, যেমন হাঁসেরা ফেরে—
সোনাই, ধলেশ্বরী, আম-জাম-হিজলের দেশে:
অইখানে হাকালুকি-চাত্‌লার ডুবোমাঠে,
কমলা-লেবুর বনে, আনারস-টিলার ঢালুতে
পিতামহদের অস্থি খুঁজতে যাবো
চাঁদিনীর রাতে...
বাঙালি-মায়ের হাতে রুপোলি চাঁদের টিপ,
বাঙালি-বোনের হাতে রক্তচন্দনের ফোঁটা,
নিতে আবার আসবো ফিরে ফিরে—
... ... ...
বার বার ফিরে আসবো, অইসব নদী মাঠ
জীবনানন্দের প্রিয় ফুল-ফল, তরু-লতা,

পরিচিত পাখিদের ভিড়ে...

জীবনানন্দের প্রভাব নিজেই স্বীকার করে নিয়েছেন কবি। পরের পঙ্‌ক্তিতেই শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের অমর শব্দগুচ্ছ পাওয়া যায়—

অনন্ত-নক্ষত্রবীথি নীলিমায় আজ শুধু ভেসে যেতে হবে...

(বিষণ্ণ পরবাস: নির্বাসন নয়)

স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে সবচেয়ে কালো দিন ৬ ডিসেম্বর, ১৯৯২[৫৫]। তবে অসমের কালো সময় অবশ্যই ১৯৮০[৫৬]। বিদেশি তাড়াও আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে নগাঁওয়ের কাছে নেলিতে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল দুটি গ্রাম। অন্তত জাতীয় সংবাদপত্রগুলি তো তাই বলে। কলকাতায় নকশাল আমলের[৫৭] ত্রাসের যাঁরা সাক্ষী, বুঝতে পারবেন আশির দশকে অসমের সেই ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গার আবহ। জার্মানি বিশ্বকাপে জিনেদিন জিদান[৫৮] যেমন নকআউট পর্যায়ে সব ম্যাচ খেলেছেন এটাই শেষবার ধরে নিয়ে ঠিক তেমন ওই সময়ে অসমের প্রতিটি বাঙালি যুবক মনে করতেন, এটাই শেষ পদক্ষেপ, আজই শেষদিন। ঊর্ধ্বেন্দুর 'সাকিন আসাম, ১৯৮৩'[৫৯] ইতিমধ্যেই ইতিহাসে পা রেখেছে। বহিরাগত তাড়াও আন্দোলনের শেষটা ছিল বাঙালি মুসলমান মারো। ঊর্ধ্বেন্দুর সমাজমনস্কতা তাঁকে দিয়ে লিখিয়ে নেয়—

'ভগ্নস্তুপের মাঝে এই পরিত্যক্ত গাঁয়ের চাতালে

আশি বছরের পোড়া রূপের দেমাক নিয়ে শুয়ে আছে আমার নানিমা' (তদেব, পৃ. ৮৫)

খুব সচেতনভাবে ঠাকুমা নন, নানিমার উল্লেখ করেছেন কবি। কবিতার পটভূমি যে ওই উত্তাল সময়।

হন্তারক মানুষের জান্তব পদচ্ছাপ বুকে নিয়ে শস্যহীন বসন্তের মাঠ,

রক্তাক্ত পাঁকে দেখো মুখ গুঁজে পড়ে আছে আমার হানিফ চাচা,...

খোদার মসজিদ আর ঈশ্বরের নামঘর, মাঝে শতাব্দীর টানা অন্ধকার পথ,

পথের দুধারে ছিন্ন শিশুর শরীর, ভিন্ন

প্রৌঢ়ের শির, দীর্ণ জননীর যুগল উরোজ।

ওদিকে ভরলি আর এধারে কলঙসুতি, কপিলি, দিখৌ—

লুইতের পার ধরে জলের উজানে যাও, জলের ভাটায় যাও,

শ্মশান—শ্মশান। (তদেব, পৃ. ৮৭)

বসন্তের মাঠ শস্যহীন থাকবেই, কিন্তু এই স্তবকের শেষ পঙ্‌ক্তিতে 'শ্মশান—শ্মশান' শব্দ এনে শস্যহীন মাঠকে অন্য তাৎপর্য দিয়েছেন কবি। আশি বছরের নানিমার পর আমরা পেয়ে যাই হানিফ চাচাকে। 'দাঙ্গার প্রতিবেদন'[৬০]-এ দেবেশ রায় আমাদের জানিয়েছেন, শিশু-বৃদ্ধ-নারীকেও ছাড় দেয় না উন্মত্ত জনতা। এখানে পথের ধারে ছিন্ন শিশুর শরীরের পাশাপাশি রয়েছে প্রৌঢ়ের ভিন্ন শির। অসম যেন তখন শ্মশানের চেহারা নিয়েছে। এ রাজ্যকে যতই ঊর্ধ্বেন্দু নির্বাসন নয়, বিষণ্ণ পরবাস বলুন, তাঁর লেখায় কিন্তু অসমের নদী-ফুল-আবহাওয়া-জীবন-প্রকৃতি স্বতঃস্ফূর্তভাবে উঠে এসেছে। কপিলি[৬১], কলং[৬২], দিখৌ[৬৩],

লুইতের পারের দাঙ্গার চালচিত্র এঁকেছেন তিনি। খানিকটা এগোলেই দেখা যায়—

চাপরি, লাহরিঘাট, গোড়েশ্বর, চাউলখোয়া, নেলি,

চামগুড়ি, গহপুর, মাজুলি, শিলাপথার, নাওজান, নিয়ামাটি, হাজো—

সর্বত্র চিতা জ্বলছে: 'এই জুই জ্বলিছে, জ্বলিব।'

বাংলা সাহিত্যের মূলধারায় স্থান পাওয়ার কথা ভেবে ইদানীংকালে অসমের কিছু বাঙালি যুবক সচেতনভাবে কবিতা-গল্পে লুইত পারের কথা লেখেন না। কিন্তু সমাজসচেতন ক্ষিতীশ সেই জলে ডুব দেননি। তাঁর 'নতুন মাতৃভূমি' কবিতা সেই ষাটের দশকেই যাকে বলে 'হিট'। এবং এখনও এই কবিতার বাস্তবতা অস্বীকার করা যায় না।

'নতুন মাতৃভূমি'[৬৪] নামেই কবিতার ভাববস্তু পরিস্ফুট। শুধু বাংলাদেশ নয়, পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরা থেকেও প্রচুর বাঙালি এসেছেন অসমে। এবং থেকে গেছেন। তাঁদের কাছেও এই অসম, ব্রহ্মপুত্র পার হল নতুন মাতৃভূমি। এই কবি অবশ্য নিজেই স্বীকার করে নেন যে তাঁর জন্ম বাংলাদেশে। তিনি এসেছেন সেখান থেকেই—

পাহাড়-ভৈয়াম হাতে হাত রেখে

যেখানে অনাদি কাল হতে

রয়েছে দাঁড়িয়ে

লক্ষ্য সমুখের দিকে— (উবুদশ, পৃ. ১৪৪)

লুইত পারের প্রকৃতি বর্ণনা করা হয়েছে প্রথম দুটি শব্দে। গোটা অসম জুড়ে রয়েছে পাহাড়ের পাশাপাশি সমতলভূমি। আক্ষরিক অর্থেই পরস্পরের হাতে হাত রেখে দাঁড়িয়ে।

ষাটের কবি বলেই হয়তো 'সমুখে' শব্দটি ব্যবহার না করে পারেননি কবি।

যে দেশেতে লুইতের পারে

ঘর বেঁধে থাকে

যেসব খিলঞ্জিয়া আর

চা-বাগিচার শ্রমী বনুয়াও— (তদেব, পৃ. ১৪৫)

জীবিকা ও মানুষের বৈচিত্র্যে লুইত পার অনন্যতার দাবি করতে পারে। পাশাপাশি রয়েছেন জনজাতি, উপজাতি, চা-বাগিচার শ্রমিক, বাঙালি, অসমিয়া— সবাই। এখন খিলঞ্জিয়া[৬৫] বলতে 'সন অব দ্য সয়েল' বোঝায়। বাংলায় বলা যায়— ভূমিসন্তান। 'শ্রমী বনুয়া'[৬৬]-র অর্থ কুলি-শ্রমিক।

পাহাড়ে পাহাড়ে ছুটে বেড়ায়

যেসব জনজাতির দল

তাদেরই মাঝে পেয়েছি আমার

বাংলাদেশে হারিয়ে যাওয়া

পুরনো সেই ঘর।

এখানে কবি স্বীকারই করে নিয়েছেন, তাঁর আদি নিবাস বাংলাদেশ। প্রাণ বাঁচাতে অসমে এসে এখন লুইত পারকেই মাতৃভূমি করে নিয়েছেন। এজন্যই কবিতার নাম 'নতুন মাতৃভূমি'। এখানেই তিনি খুঁজে পাচ্ছেন ছেড়ে আসা ঘর।

সত্তর দশকে প্রমোদরঞ্জন লিখেছেন বিহুরানির[৬৭] পিতা-প্রব্রজক। যিনি লুইত পারেই খুঁজে পান পদ্মা-মেঘনার[৬৮] আদর। আর তাঁর আগেই অন্যভাষায় প্রায় একই কথা লিখেছেন ক্ষিতীশ—

পরকে যারা আপন করে

বুকে আকুলিয়াই লয়

সকলের তরে অবারিত দ্বার চিত্ত অসংশয়

তাদের কে বা আপন, কে বা পর— (তদেব, পৃ. ১৪৫)

কলকাতা যেমন বিভিন্ন ভাষাভাষীর মানুষকে আপন করে নিয়েছে, ঠিক তেমনই লুইত। রেললাইন পাতা হবে বলে বিহারের এক শ্রেণির মানুষকে এখানে আনা হয়েছিল। চা-বাগিচা পত্তনের সময় সাঁওতালদের সঙ্গে এসেছিলেন নেপালিরা। ওই চা-বাগানেই আদিবাসীদের দেখতে পাওয়া যায়। যাঁরা এতাবৎ অঞ্চলে চা-শ্রমিক হিসেবে পরিচিত। কবি সার্থকভাবেই লিখেছেন, 'সকলের তরে অবারিত দ্বার চিত্ত অসংশয়'[৬৯]। সবাইকে বুকে আঁকড়ে নিয়েছে এই নতুন মাতৃভূমি।

যেখানে আকাশ সেটি জল

আমায় দিয়েছে নতুন বাসস্থল

সে যে আমার চির চেনেহী আশ্রয়দাত্রী

চির মরমর দেশ নতুন মাতৃভূমি। (তদেব, পৃ. ১৪৫)

বাংলা কবিতা-পাঠকের কাছে 'চেনেহী'[৭০] ও 'মরমর'[৭১] শব্দ অচেনা ঠেকবে। চেনেহি হল স্নেহ এবং 'মরমর' শব্দের অর্থ আদরের। এবার পড়তে আর অসুবিধে হয় না। এই লুইতপার 'আমায় দিয়েছে নতুন বাসস্থল'। সে যে আমার চির স্নেহের আশ্রয়দাত্রী। হালকাভাবে আমাদের মনে আসে মায়ের কথা। বহু ঝড়-ঝঞ্ঝাতেও যিনি আঁচল বিছিয়ে রাখেন আশ্রয়ের। চির আদরের দেশ নতুন মাতৃভূমি। 'এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি'-র সুরটি এখানে জাগ্রত।

'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে'[৭২]-র কালকূট[৭৩] বা সমরেশ বসু আর কিছু না লিখলেও যেমন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে থেকে যেতেন, ক্ষিতীশ রায়ের ক্ষেত্রে অমৃতকুম্ভ হল এই 'নতুন মাতৃভূমি' কবিতাটি।

ব্রহ্মপুত্র পারের বাঙালি কবিদের মধ্যে ঊর্ধ্বেন্দু দাশই প্রথম সচেতনভাবে সমমনস্কদের নিয়ে লিটল

ম্যাগাজিন, কবিতা লেখা, পত্রপত্রিকা সংগ্রহ, সাহিত্যের নতুন ফর্ম নিয়ে ভেবেছেন। তাঁর সেই সময়ের অবিচ্ছেদ্য কমরেড ছিলেন ক্ষিতীশ রায়।

ষাটের দশকে ডিব্রুগড়ে ঊর্ধ্বেন্দু দাশ যেমন কাব্যচর্চায় নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ঠিক তেমনই নগাঁওয়ে বসে একমনে কবিতা লিখেছেন জীবন নাথ। অমলেন্দুর বাংলা কবিতাবই একটিই, কিন্তু জীবন নাথ বেশ কয়েকটি কাব্যগ্রন্থের প্রণেতা। তাঁর 'শাশ্বতী সমা'[৭৪], 'মা নিষাদ'[৭৫], 'পুষ্পমোচনের উদ্ভিন্ন রাগে'[৭৬]-র বিভিন্ন পঙ্‌ক্তি এখনও প্রবীণদের মুখে শোনা যায়। ব্রহ্মপুত্র পারের জল-মাটি-বাতাস তাঁকে কতটা শুষে নিয়েছে তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর সম্পাদিত লিটল ম্যাগাজিনের নাম 'ব্রহ্মপুত্রে ভাসমান ভেলা'[৭৭]-র মধ্যে।

সমকালীন দুই কবি পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকলেও একে অন্যের নাম জড়িয়ে সাধারণত কবিতা লেখেন না। অবশ্য জয় গোস্বামীকে[৭৮] নিয়ে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় অল্প সময়ের ব্যবধানে অন্তত দুটি কবিতা লিখেছিলেন এমনটা দেখতে পাওয়া যায়। লুইত পারের কবি জীবন নাথ অসমিয়া সাহিত্যের প্রবাদপুরুষ লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়াকে[৭৯] নিয়ে লিখেছেন 'পুষ্পমোচনের উদ্ভিন্ন রাগে'। কবিতাটিতে রয়েছে দুশোরও বেশি পঙ্‌ক্তি।

ষাট-আশির দশকে অসমিয়া-বাঙালির তিক্ত সম্পর্ক এই সেদিনের স্মৃতি। যে ঘায়ের দাগ এখনও মিলিয়ে যায়নি ব্রহ্মপুত্র পারের বাঙালিদের শরীর-মন থেকে। অথচ পূর্বজ অসমিয়া কবির প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন জীবন নাথ। এই কবিতায় অসমের নদী-জল-মাটির গন্ধ পাওয়া যায়। সাবলীল-স্বতঃস্ফূর্তভাবেই কবি ব্যবহার করেছেন 'নাও ভাসে ব্রহ্মপুত্র নদের জলে'। জানি না পরে লিটল ম্যাগাজিনের নামকরণে উপর্যুক্ত পঙ্‌ক্তিটিই তাঁকে ভাবিয়েছিল কি না। তাঁর সম্পাদিত ছোট পত্রিকার নাম— ব্রহ্মপুত্রে ভাসমান ভেলা। আর লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়াকে উৎসর্গ করে তিনি লিখেছিল ১৯৬৮ সালে— নাও ভাসে ব্রহ্মপুত্র নদের জলে।

'ঈশানের কোণে লৌহিত্য-পারে'[৮০] পঙ্‌ক্তি পড়ে আমাদের অর্থ বুঝতে কোনও অসুবিধে হয় না। কেননা এই অঞ্চল অনেকদিন ধরেই চিহ্নিত হয়ে রয়েছে ঈশান বাংলা হিসেবে। ব্রহ্মপুত্র প্রতিভাত হয় লুইত নামে। এবং লুই বা লুইত এসেছে লৌহিত্য থেকে।

'বরপেটা[৮১] গাঁয়ের মাটির শরীরে/তীরভাঙা প্লাবনের জলছবি, কীর্তন-নামগান'। একটা জন্ম শুরু হচ্ছে। লুইতপারের একটি জেলা বরপেটা। আর নদীমাতৃক অসমের বন্যার কথা কে না জানে। ১৯৬৮ সালের পরিপ্রেক্ষিতে সে জেলায় বর্ষাকালে বন্যা হওয়াই স্বাভাবিক, এবং তাই হয়েছিল। আর তাই 'প্লাবনের জলছবি'। অসমিয়া সংস্কৃতির মুখ্য উপজীব্য নামগান। এ যেন অনেকটা ব্রাহ্মদের প্রার্থনা সংগীত। কীর্তন-নামগানের 'উত্তরে বাণরাজার রাজধানী প্রান্তর'। পুরাতত্ত্ববিদ নারায়ণচন্দ্র সরকারের 'বাণাসুর'[৮২] নামক একটি বই রয়েছে। অসমের সঙ্গে এই বাণ রাজার বহুদিনের সংস্রব। 'ভাওনা-রসিক'[৮৩] লক্ষ্মীনাথ পড়েছিলেন 'মদনমোহনের শিশুশিক্ষা'[৮৪]। এবং পড়েছেন 'অসম বুরঞ্জিবিদ বিখ্যাত কালীনাথ'কেও[৮৫]। 'অশ্বক্লান্ত[৮৬] উমানন্দ[৮৭] উর্বশী[৮৮] আর/নবগ্রহ বশিষ্ঠের অভিসারিক টানে...লুইতের রিহা-মেখলা' দেখেই মনে পড়ছে পঞ্চাশের কবি অমলেন্দুর কবিতাতেও 'রিহা-মেখলা' শব্দটি পাওয়া গেছে। একই অঞ্চলের কবিদের উপমা-শব্দ ব্যবহারও তাহলে একইরকম! গুয়াহাটির পার্শ্ববর্তী তীর্থস্থানগুলিরই নাম অশ্বক্রান্ত, উমানন্দ, উর্বশী, নবগ্রহ, বশিষ্ঠ।

জীবন নাথের কবিতা এভাবেই এগিয়ে চলে। কবিতার মধ্যে ব্যঙ্গ, স্যাটায়ার রাখেন ইচ্ছে করেই। এখানে আলোচ্য নয়, তবু বলতে হচ্ছে, তাঁর গদ্য লেখার মধ্যেও এই ভঙ্গিটি সদা বিরাজমান।

কবিতা যে প্রকৃতপক্ষে মন্ত্র— এই বোধ নিয়ে অসমে প্রথম কবিতা লেখেন সত্যেন চৌধুরী। মরিয়নির[৮৯] অধ্যাপক সত্যেন চৌধুরী[৯০] বয়সে ঊর্ধ্বেন্দু দাশ, ক্ষিতীশ রায়ের প্রায় সমসাময়িক। অসমিয়া কবি দুর্গা হাজরিকার[৯১] সঙ্গে যৌথভাবে তিনি একটি কবিতাপুস্তিকা প্রকাশ করেন ১৯৭১ সালে। 'সাঁকো'[৯২] নামক ওই পুস্তিকায় সত্যেনের কবিতা রয়েছে চোদ্দটি। এবং এ ছাড়া তাঁর আর কোনও কবিতা কোথাও চোখে পড়েনি। অনেকটা সমর সেনের মতোই কবিতা জগৎ থেকে স্বেচ্ছা নির্বাসন নিয়েছেন এই কবি এরকমই বোধ হয়। অথচ সমকালীন সময়ে সত্যেন ছিলেন অত্যন্ত শক্তিমান অন্তত তাঁর কবিতা তো তাই বলছে। তাঁর প্রত্যেক কবিতাই উল্লেখযোগ্য। কিন্তু একেবারেই অপ্রচারিত এবং অনালোচিত এই কবি। কিছুটা বিস্ময়করও বটে।

'ভোগদৈ; তোমার রুপোলি খামে
আমি—
আমার মায়ের চিঠি পাই।

নিশুতি রাতে—
যুদ্ধ যখন থেমে যায়
পরাজিত সৈনিক
বিপক্ষ দলের শিবিরে বন্দী
তখন—
ভোগদৈ; তোমার রুপোলি খামে
সোনালি চিঠি আসে।

আর—
সে চিঠিতে মুক্তির আনন্দ।' (তদেব, পৃ. ১৫০)

'মায়ের চিঠি'[৯৩] কবিতায় এই ভোগদৈ[৯৪] উজান অসমের একটি নদী। মানুষের চিরন্তন ভালোবাসার আকুতি স্বচ্ছভাবে এখানে ধরা পড়েছে। পরাজিত সৈনিক জীবনযুদ্ধে পরাজিত। স্নেহ-আদরের জন্য যে কাঙালপনা তাতে মায়ের চিঠি ভালোবাসার প্রলেপ দেয়। এবং ওই চিঠিতেই থাকে— মুক্তির আনন্দ। এই কবিতায় তিনটি পঙ্‌ক্তি এক শব্দের। আমি, তখন ও আর। এবং প্রত্যেক শব্দের পাশেই কবি সচেতনভাবে '—' ব্যবহার করেন। এরপর কিছু আছে এবং সেজন্য পাঠকের প্রত্যাশা আরও বেড়ে যায়।

বাংলা কবিতার পাশাপাশি অসমিয়া ভাষাতেও কবিতা লিখে সফল যদি কারও নাম করতেই হয়,

অবশ্যই তিনি রবীন্দ্র সরকার[৯৫]। হেমাঙ্গ বিশ্বাস, অমলেন্দু গুহের ধারায় চলেছেন তিনি। অমলেন্দু 'লুইত পারের গাথা'র পর আর তেমন বাংলা কবিতা লেখেননি। কিন্তু রবীন্দ্র সরকার এখনও দুই ভাষাতেই সৃষ্টিশীল। ঊর্ধ্বেন্দু, ক্ষিতীশ, রবীন্দ্র সরকার এঁরা একই সময়ে জন্মেছেন। প্রত্যেকেই কবিতা লেখা শুরু করেছেন তরুণ বয়সে। ডিব্রুগড়ে ঊর্ধ্বেন্দু যখন কাব্যচর্চা শাণিত করছেন, গুয়াহাটিতে কবিতার নিরলস সাধনায় ব্রতী রবীন্দ্র।

রবীন্দ্র সরকারের সাম্প্রতিক কবিতা 'শিল্পী'-তে শিল্পীর গভীর দুঃখবোধের পাশে সৃষ্টির আনন্দ প্রতিভাত।

'কেকারু বর্মন মুখোশের পর মুখোশ বানায়'[৯৬] সংবাদপত্রের বিবৃতি পড়ছি যেন। কীভাবে বানায় মুখোশ? 'রং আর তুলির টানে ছন্দোময়য় আঙুলগুলো নেচে ওঠে/...হাতিঠাকুরেরা নেমে আসেন পাহাড়ের ঢাল বেয়ে।' কেকারু বর্মন নামটা কি চেনা চেনা ঠেকছে? হয়তো তাই; কেননা দেবেশ রায়ের তিস্তাপারের বৃত্তান্ত[৯৭] বা তিস্তাপুরাণে এধরনের নাম পেয়েছি—বাঘারু[৯৮]। বাঘারুর মতো বা আরও সঠিকভাবে মহাশ্বেতা দেবীর[৯৯] উপন্যাসের চরিত্রদের মতো আমাদের আলোচ্য শিল্পী থাকেন—

'লাল মাটি আর শাল-মহুয়ার দেশে

জঙ্গল কেটেই বসত—

কেকারুর ঘর।' (তদেব, পৃ. ১৫৪)

শঙ্খ ঘোষের ভাষায় বলা যায়— চুরি হয়ে যায় শুচিতা, সামঞ্জস্য ; সবকিছু। কেকারুর সামনে 'ঋতুর পর ঋতু আসে/লাল নীল প্রজাপতি পাখনায় রোদ মেখে/গায়ে এসে বসে।' রোদমাখা লাল নীল প্রজাপতি গায়ে নিয়ে কেকারুর আঙুল তুলির টানে ছন্দোময়। অসাধারণ চিত্রকল্প। প্রজাপতি সৌন্দর্য-সৌভাগ্যের প্রতীক। অথচ কেকারুর চোখের জলে ভিজে যায় মুখোশের পর মুখোশ। তার আদিমতা লুণ্ঠিত, সে আর অনাঘ্রাত-পবিত্র-মাটির গন্ধমাখা ভালোমানুষ থাকতে পারছে না। তার 'খালি পেটে খিদে জ্বলে ওঠে/তৃষ্ণায় বুক ফাটে/শূন্য থালার মতো চাঁদ উঠে ডুবে যায়।/আঁধারের মুখে আগুন দিয়ে/কেকারু বর্মন মুখোশ বানায়।'

রবীন্দ্র সরকারকে বলা যায় সত্তরের কবি। ওই দশকে অসমিয়া কবিদের রচনায় যে বামপন্থী ছোঁয়া দেখা যায় তার জন্য কিছুটা কৃতিত্ব দাবি করতে পারেন রবীন্দ্র সরকার। অবশ্য তাঁর নিজের কবিতায় ছায়া ফেলেছেন নাজিম হিকমত[১০০]।

লুইত পারের মূল ভাষা অসমিয়া। বাঙালিরা বিভিন্ন সময়ে এখানে এসে একেকটা অঞ্চলে সন্নিবিষ্ট হয়েছেন। যাকে ইংরেজিতে 'বেঙ্গলি পকেট' বলা যায়।

লামডিং, হোজাই, লংকার পাশাপাশি গুয়াহাটির কয়েকটি স্থানে বাঙালিরা ঘন হয়েছেন। আবার গুয়াহাটির বাইরে খারুপেটিয়ায় প্রচুর বাঙালির বাস। একইভাবে তা দেখা যায় ধুবড়ি, বঙাইগাঁও, বরপেটা রোড, নগাঁও, মরিয়নি, ডিগবয়, ডিব্রুগড় প্রভৃতি অঞ্চলে।

খারুপেটিয়া থেকে গত চল্লিশ বছর ধরে নিরলস সাহিত্যচর্চা করে চলেছেন প্রমোদরঞ্জন সাহা। পর্ব হিসেব করলে তাঁকে সত্তরের দশকে রাখা যায়। অসমে প্রতিষ্ঠিত বাঙালি কবিদের মধ্যে প্রমোদরঞ্জনের কবিতাবইয়ের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি ছিল, সম্প্রতি তাঁকে টপকেছেন প্রবীণ কবি জীবন নাথ।

প্রমোদরঞ্জন কবিতা লিখতে শুরু করেন ষাটের দশকে। যখন অসমের প্রত্যেক বাঙালির মনে আতঙ্কের পরিবেশ। ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন এই সময়েরই ফসল। এবং তাঁর কবিতায় সার্থকভাবেই ফুটে উঠেছে অসমিয়া-বাঙালি দাঙ্গার মনন।

'অসমে এখন রক্তধূলির ঝড়

কোন আকাশে ওঠাবে রামধনু

হে অনেকদিনের ঈশ্বর

বলো না গো জননী

গহপুর কোকরাঝাড়ে ব্রহ্মপুত্র আছে কি নেই?' (বাংলা কবিতাচর্চার রূপরেখা, পৃ. ৩৭২)

এই পঙ্‌ক্তিগুলি হয়তো কবিতা হিসেবে তত উঁচুমানের নয়, কিন্তু যে সময়ের কবিতা তাতে ইতিহাস দাবি করতে পারে প্রমোদরঞ্জনের এসব স্তবক। সত্যিই তখন অসমে ছিল রক্তধূলির ঝড়। তারপরেই প্রমোদরঞ্জন তাঁর কবিতাশক্তির পরিচয় দেন ঈশ্বরের আগে 'অনেকদিনের' শব্দটি বসিয়ে। ঈশ্বরের কাছে শান্তিই তো খুঁজবে মানুষ। অথচ সমাজ জুড়ে ক্লেদ। কবি মনে করছেন, এই ক্লেদাক্ত পরিবেশে রামধনু সৃষ্টি করতে ঈশ্বরও চাইবে না।

শান্তিনিকেতনের বিখ্যাত পৌষ উৎসবের সঙ্গে যেমন কোনও ভগবানের অনুষঙ্গ জড়িত নেই, ঠিক তেমনই অসমের বিহুর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে প্রকৃতি। হ্যাঁ, হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে স্বতস্ফূর্তভাবে এই উৎসবে অংশ নেয়। এবং পিছিয়ে থাকেন না বাঙালিরাও, বাঙালি কবিরাও। অমলেন্দু, জীবন নাথ হয়ে প্রমোদরঞ্জনও তা উপেক্ষা করেননি। তাঁর একটি কবিতার নামই 'বিহু'।

'এইমাত্র শেষ হয়ে গেল

একটি গভীর উৎসব

প্রার্থিত সময়ের প্রার্থনায়

অন্তর্নিহিত ঘর্মাক্তের পর'

খুব সচেতনভাবেই প্রথম স্তবকের শেষে কোনও যতিচিহ্ন ব্যবহার করেননি কবি। একটু আগেই আমরা পড়ে এসেছি 'অনেকদিনের ঈশ্বর'[১০১]-এর রূপকল্প। এবার পাওয়া যাচ্ছে 'গভীর উৎসব'[১০২]। এই উৎসব কী? না, বিহু।

অসমের প্রান্তেই রয়েছে প্রকৃতির অপার বিস্তার। মানস অভয়ারণ্য বহুদিন ধরেই আবিশ্বের মানুষকে টানে। মানসে এলেও পর্যটকরা জানেন না বিহুর কথা। অসমের 'গভীর উৎসব'-এর কথা। তাঁরা ভ্রমণার্থীর মতো খোঁজ করেন কাঁচা আনন্দের।

'মানসে পিকনিক সেরে

কিছু মানুষ মানুষী

খোঁজ করে গেল

বহাগীর কোমল বুকে নাচের ছন্দ’

পাঠক, মনে আছে, প্রথম স্তবকের শেষ শব্দটি ছিল ‘পর’। এই ‘পর’-এর পর কবি লিখছেন ‘মানসে পিকনিক সেরে’[১০৩] তার আগে চলে গেছে প্রার্থিত সময়ের প্রার্থনায় অন্তর্নিহিত ঘর্মাক্ত হওয়ার কথা। পর্যটকের সাময়িক আনন্দবিলাসের কথা কবির কলমে ফুটে ওঠে,

‘খোঁজ করে গেল বহাগীর কোমল বুকে নাচের ছন্দ’-কে।

প্রকৃতির উৎসব বলেই বিহুতে এক রানি থাকে। যাকে বিহুরানি বলা হয় এখানে। কবি জানাচ্ছেন—

এইবার বিহুতে

বিহুরানি হয়েছিল বৈজয়ন্তী

যার পিতা এক প্রব্রজিত পুরুষ

যার ধমনীতে প্রজ্বলিত পদ্মা মেঘনার আদর

বিহুরানি হয়েছিল বৈজয়ন্তী পর্যন্ত পড়তে অসুবিধা হয় না। বৈজয়ন্তীদেরই তো হওয়ার কথা বিহুরানি। কিন্তু ‘যার পিতা একজন প্রব্রজিত পুরুষ’! কার কথা বলছেন অসমের বাঙালি কবি? দেবেশ রায় তাঁর ‘তিস্তা পারের বৃত্তান্ত’-তে বিশদ করে লিখেছেন প্রব্রজিত মানুষের কথা। আর অসমের বাঙালি জীবন-অভিজ্ঞতায় জানেন প্রব্রজন কী বিষময় হতে পারে।

অসমিয়া-বাঙালি সম্পর্কের এক জটিল টানাপোড়েনের কথা সহজভাবে মিলিয়ে দিচ্ছেন কবি। বিহুরানির পিতা এসেছে প্রব্রজনের মাধ্যমে। যে এক প্রব্রজিত পুরুষ। হ্যাঁ, কবি এইবার বিহুতে পেয়ে যাচ্ছেন এক বাঙালি বিহুরানিকে, বৈজয়ন্তী যাকে বলা হচ্ছে। যার পিতার ধমনীতে প্রজ্বলিত পদ্মা মেঘনার আদর। বুদ্ধদেব গুহ[১০৪] তাঁর ‘মাধুকরী’[১০৫] উপন্যাসে লিখেছিলেন, কবিরা সব অমৃতের সন্তান। এখানে প্রমোদরঞ্জন সম্পর্কে এই উপমা অমোঘভাবে প্রযোজ্য।

‘এইবার বিহুতে

আলোকসজ্জা ছিল অত্যুজ্জ্বল

সত্যি ব্রহ্মপুত্র হৃদয় ছড়াতে জানে

সত্যি তার বুকেও

পদ্মা মেঘনার মতো আদর আছে বিস্তর।’

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের[১০৬] গল্প-উপন্যাসে ছড়িয়ে রয়েছে কলকাতা কী করে আপন করে নেয় সবাইকে। কলকাতা যেন এক সর্বগ্রাসী পুরুষ। ঠিক তেমন এই কবিতায় ব্রহ্মপুত্র। কবি স্বগতোক্তি করেছেন ‘সত্যি ব্রহ্মপুত্র হৃদয় ছড়াতে জানে’।[১০৭] জানেই তো, এর পারেই তো আশ্রয় নিয়েছে বাঙালি, অসমিয়ারা। বাংলাদেশ ছেড়ে আসার ঈষৎ ব্যথাও যেন টের পাওয়া যাচ্ছে— পদ্মা মেঘনার মতো আদর[১০৮] আছে বিস্তর।

অসমের অনুষঙ্গ নিয়ে প্রমোদরঞ্জনের আরেকটি কবিতা ‘বয়স গেছে দাঁড়িয়ে’। কবিতা হিসেবে ততটা

না দাঁড়ালেও ব্রহ্মপুত্র পারের কথা কবি ফুটিয়ে তুলেছেন বরদৈচিলা[১০৯], কপৌ ফুল, বিহুকুমারী[১১০], নাহর, ডিগবয়, নাহরকাটিয়া, কাজিরঙা[১১১], ভোগদৈ, লুইত প্রভৃতি শব্দে।

অজিতকুমার দত্তের 'শিলং'[১১১] কবিতা শুরু হয়— সুন্দরী শিলং/ মৌসুমী মন্থর/স্বপ্নের অন্বিষ্ট অন্বয়/মননে ও ভালবাসায়/অতলান্ত সাগরের গভীরতা—দিয়ে। পাশাপাশি তখনই সাম্প্রতিক পরিস্থিতি কীরকম তার বর্ণনা দিয়েছেন কবি— 'হাতে পত্রিকাখানা:/যুদ্ধ/মহামারী/মৃত্যু সুন্দরী শিলং', কবি দেখতে পাচ্ছেন— কফিনের নির্মোক সারি সারি/ভ্রূণের মৃত রক্ত/মননে ও ভালবাসায়/সমুদ্র ফেনার নিবিড় আর্দ্রতা।

আশির দশকে দেবীপ্রসাদের[১১৩] মতো আরও কয়েকজন কবির দেখা পাওয়া যায়। যাঁরা পরে আর সিরিয়াস কাব্যচর্চা করেননি। মৃদুলকান্তি দে,[১১৪] কিশোর ভট্টাচার্যের[১১৫] নাম এপ্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। কবিতার নৌকোয় পা রেখেছিলেন, শক্তি কম ছিল না কিন্তু শেষপর্যন্ত কবিতার রুগ্ণ শরীরকে ত্যাগ করেন তাঁরা।

কিশোর ভট্টাচার্য প্রথম থেকেই মিষ্টি ছন্দে কবিতা লিখেছেন—

একটি যুবক কাঠ কাটত

নদীর ধারে সূর্য ডোবার সময়

হেঁটে আসত মেয়েটি

ভারতের যত রাজ্য আছে তার মধ্যে অসমেই আনুপাতিক হারে সবচেয়ে বেশি বনাঞ্চল। এই অঞ্চলের যুবকের দিন গুজরানের মধ্যে কাঠ কাটার প্রসঙ্গ খুব স্বাভাবিক। কিশোরকে অতিরিক্ত কোনও চেষ্টা করতে হয়নি, খুব সাবলীলভাবে তাঁর কলমে উঠে এসেছে কাঠ কাটার গল্প।

একদা বিকেলবেলা ছমছমে অন্ধকার

রাজার কেউ মেয়েটিকে

নিয়ে গেল চলে

কিশোরের 'বিহুগীতের[১১৬] বদলে একটি কবিতা'-য় লুইতপারের স্বাভাবিক অনুষঙ্গ বিরাজমান।

মোষের শিঙের মতো তীব্র বাঁশির ডাক শুনি

পেঁপা[১১৭] নামে এক বাঁশি আছে যা মোষের শিং দিয়ে তৈরি হয়। এই অনুভব অসমের বিশেষ করে ব্রহ্মপুত্রের পারের কবি ছাড়া সম্ভব নয়।

আর কিশোরের ওই কবিতাপঙ্‌ক্তি তো এখন মিথ— হুররে আজ আসাম অ্যাকর্ড।

অসমিয়া ভাষার মূল কবিদের মধ্যে দু-একজনই মাঝে মাঝে বাংলা কবিতা লিখেছেন। সনন্ত তাঁতি[১১৮] ও সমীর তাঁতি[১১৯] এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। সনন্তের কবিতায় বামপন্থী মতাদর্শ খুঁজে পাওয়া যাবে। তাঁর বিখ্যাত কবিতার নামই— হামদের কথা বাবুরা বলেন[১২০]। যে কবিতার ছত্রে ছত্রে শোষণ, বঞ্চনার চিত্র ফুটে উঠেছে।

অসমের অর্থনীতিতে অনেকটা প্রভাব বিস্তার করেছে চা-শিল্প। এই কবিতা চা-শ্রমিকদের কথ্য ভাষায় রচিত।

'হামদের পেটে আগুনের মতো খিদা

হামদের রুটি ও ভাত চাই' (তদেব, পৃ. ৩৭৪)

খুব অল্পই চাওয়া। শোষিত হতে হতে একসময় ভালোভাবে বাঁচার ইচ্ছেটাও শেষ হয়ে যায়। অন্ধকার জীবনই নিয়তি বলে মেনে নেয় অধিকাংশ বঞ্চিত শোষিত মানুষ।

এদের শরীর পাথরের মতো খোদাই ভারী নিতম্ব

কালো শরীর প্রসারিত যৌবন এরা গান গায় ঝুমুর নাচে

এগুলো বাবুদের ভাষা। আর শোষিতের ভাষা— হামরা বুঝি না ভাষা ও কবিতা।... হামরা বুঝি না অক্ষর।

এটাই আসল কথা যে— এরা মারে না কামড়। কাজেই ইচ্ছেমতো শোষণ করো।

ইদানীংকালে নীরব কবি যদি কাউকে বলা যায় তো তিনি তপন মহন্ত[১২১]। কবিতার বই 'অন্ধকারে পৌর্ণমাসী'[১২২] প্রকাশিত হওয়ার আগে অন্যান্য পত্র-পত্রিকায় তপনের কবিতা বিশেষ দেখা যায় না। এ যেন হঠাৎ আত্মপ্রকাশ। তাঁর কবিতা সম্পর্কে আমাদের কিছু বলতে হয় না, বইটির শেষ পাতায় (ব্যাক কভার) বড়ো সুন্দর বিশ্লেষণ রয়েছে।

'কবি তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থের ছোট ছোট সহজ সরল কবিতায় জটিল কবিতায় জটিল সময়ের দিনলিপি এঁকেছেন। তাঁর প্রতিটি কবিতায় খুঁজে পাওয়া যায় গল্পের আভাস বা বিরোধাভাস। ইতিহাসের ক্ষণিক উঁকি-ঝুঁকি। শব্দের ইট গেঁথে তৈরি করা যুদ্ধ-বিরোধী বাঙ্কার, ধ্বংসস্তূপে জেগে ওঠা শান্তির শাশ্বত দিন, সন্ত্রাসের অস্পষ্ট আলপনা আর রক্তের ক্ষরণে ফুটে ওঠা বিরহ-ভালোবাসার অনুরণন। মূক অসহায় মুহূর্তেও শব্দাবলির সামগ্রিক রেখা জলস্রোতের মতো চেতনার কুলপ্লাবী। সাম্প্রদায়িক বিষাক্ত আবহাওয়া যখন মানুষকে প্রায় প্রতিবন্ধী করে দেয়, সেই অন্ধকার মুহূর্তেও আলোকযাত্রী কবি ছবি-গান-কবিতার স্বপ্নময় জনপথ দিয়ে হেঁটে যান অটল ভঙ্গিমায়...'

এই সময়ে গোটা বিশ্ব জুড়েই সন্ত্রাস এক বিশেষ স্থান অধিকার করে নিয়েছে। অসম তথা উত্তর-পূর্বে তো সন্ত্রাসের আশঙ্কা আরও তীব্র। পথে নামলেই মনে হয়, এই বুঝি বিস্ফোরণে উড়ে গেলাম। রাতে বাড়ি ফেরার সময় খুন হয়ে যেতে পারি।

ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় বিস্ফোরণ-নাশকতা প্রায় জলভাতের সমান হয়ে গেছে। অন্তত তপনের কবিতা তাই বলছে—

ক্যামেরার মুখোমুখি বসে

উনি বললেন,

দুর্ঘটনার কারণ এখনও অজ্ঞাত

নাশকতা হতে পারে নাও হতে পারে

তদন্ত চলছে...

পত্রিকা অফিসে

খবর পাঠাল সাংবাদিক

গতবারের রিপোর্টটাই ছাপতে দিল

অবশ্যই স্থান কাল পালটে।

ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার অন্যতম শক্তিমান কবি সঞ্জয় চক্রবর্তীকে[১২৩] দশকওয়ারি বিশ্লেষণে নব্বইয়ে রাখতে হবে। সঞ্জয়ের একমাত্র কবিতা বই, তরঙ্গতাড়িত হয় ১৯৯৮ সালে। গ্রন্থিত কবিতাপর্ব ছিল ১৯৯২-১৯৯৬। সঞ্জয় সম্পাদনা করতেন 'মহাবাহু'[১২৪] পত্রিকা। লিটল ম্যাগাজিনের স্বাভাবিক পরিণতি হিসেবে যা অচিরেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সম্প্রতি মহাবাহু ফের প্রকাশিত হয়েছে। সঞ্জয়দের সেখানে বিস্তৃত পাওয়া যাবে আশা রইল।

সঞ্জয় এবং তপন রায়[১২৫] যে আঙ্গিকে কবিতা নির্মাণ করেছিলেন ব্রহ্মপুত্র পারে তা অনাস্বাদিত ছিল। সঞ্জয়ের কবিতায় সবসময় কোনও না কোনও বার্তা থাকে, নিদেনপক্ষে বিবরণ। অসমিয়া-বাঙালি সম্পর্ক নিয়ে যাঁরা লেখালিখি করছেন বা করেছেন সঞ্জয় ওই তালিকার উপরের দিকে থাকবেন। এবং সঞ্জয় হচ্ছেন বহির্বিশ্বের কাছে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার বাঙালির মুখ।

'ডবকার মেয়েটি কি জানে ঈশ্বরচন্দ্রের কথা?

সে শুধু এক্কাদোক্কা খেলে আর

বাংলাভাষাকে বাঁচিয়ে রাখে পাঠশালায়।' (তদেব, পৃ. ৩৭৬)

এখানে তথ্য হিসেবে যোগ করা যেতে পারে, ডবকা অসমের একটি স্থানের নাম। মেয়েটির আগে ডবকা বসে দুটি অর্থ তৈরি করেছে। ডবকার মেয়েটি নাকি ডবকা মেয়েটি? নারীশিক্ষার জন্য স্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র[১২৬]। এক্কাদোক্কা খেলা মেয়েটির তাঁর নাম জানার দায় নেই। সে শুধু 'দুয়েক পলক/বৃষ্টিভেজা/বাংলাভাষা'-কে বাঁচিয়ে রাখতে যায় বাংলা মাধ্যমের পাঠশালায় গিয়ে।

ব্রহ্মপুত্র পারে অসমিয়া-বাঙালি সহাবস্থান। সঞ্জয় সঠিকভাবেই লিখেছেন—

'যাদের সঙ্গে আমার দিবস রজনী

তারা জানে না রবীন্দ্র সংগীত।

যেমন আমার ঘরে এখনও বাজেনি

জুবিনের কোনও গীত।'

গোটা দিন কেটে যায় অন্যভাষী মানুষের সঙ্গে! রবীন্দ্রনাথকে জানার তাঁদের কোনও দায় নেই। আর বাঙালি কবির ঘরেও বাজেনি অধুনাবিখ্যাত অসমিয়া গায়ক জুবিন গার্গের[১২৭] কোনও গান। এখানে রবীন্দ্র ঐতিহ্যের সঙ্গে জুবিন নন, অসমের কোনও ঐতিহ্যশালী গীতিধারা যেমন বরগীত[১২৮] থাকলে ভালো হত। তবে সঞ্জয়কে বোকা ভাবার কারণ নেই কিংবা তাঁর অজ্ঞতা নিয়ে ব্যঙ্গ করলে নিজেকেই মূর্খ প্রমাণিত হতে হবে। কেননা এই কবি 'আমাদের উৎসবের টেবিল' কবিতায় লিখেছেন— 'তার নাম যদি বলি তো সে ঈশ্বরচন্দ্রের গ্রামের নদ' অর্থাৎ দামোদর[১২৯]। জানাচ্ছেন— 'তাঁর দুঃখী সিডিতে চালিয়ে

দেয়/কৃষ্ণমণি চুটিয়ার গান'। পাঠক এখানে সিডির আগে 'দুঃখী' শব্দটির ব্যবহার লক্ষ করুন। বলছেন— 'যে সুরকে জয় করে হয়েছিল সুরজিৎ/...হাতে গিটার নিয়ে গেয়ে চলে বব ডিলানের[১৩০] গান'। একটু পরেই পেয়ে যাই— 'নলবাড়ি বেলশরের সেই সুঠাম কিশোর'-কে 'যে তার ছোট্ট গ্রাম বিল্লেশ্বরকে একদিন আলোকিত করেছিল'। এই কিশোর কুড়ি বছরে আর কিশোর থাকে না এবং তখন গেয়ে ওঠে 'উদাত্ত কণ্ঠে কামরূপী লোকগীত'। 'মিসিং গান— সাকরি কামং'[১৩১]-এর পাশাপাশি 'ব্রাহ্মণবাড়ির একটি ছেলের গলায় জয়ন্ত হাজরিকা' চলে আসেন। 'বোড়ো গ্রামের খোলা মাঠের ওপর বাগরুম্বার মাদল'[১৩২] শুনিয়েছেন সঞ্জয়। এবং কখনো ভুলে যাননি তাঁর শিকড় ব্রহ্মপুত্র পারে। নচিকেতার 'বৃদ্ধাশ্রম'[১৩৩] এবং সুমনের 'দশ ফুট বাই দশ ফুট'[১৩৪] ঘরের কথা পাচ্ছি এখানে।

আমি যেমন যাব বিহুতলি, শুনব পার্বতীপ্রসাদের গীত

তুমিও তেমনি, হঠাৎ কখনও, শুনে নিও রবীন্দ্রসংগীত।

সঞ্জয়ের 'শোণিতপুরে রক্তকরবী'[১৩৫] ও 'বাবা'[১৩৬] প্রায় লোককথায় পরিণত হয়েছে। শক্তিমান এই কবি মৃদুছন্দে অন্ত্যমিলে লিখেছেন 'বাবা'। এই কবিতা এতই তীব্র অথচ সরল যে আলোচনার তোয়াক্কা করে না। বরং সঞ্জয়কে কেন ব্রহ্মপুত্রপারের বাঙালির মুখ আখ্যা দেওয়া হয় সেটা প্রাঞ্জল করা যাক।

ব্রহ্মপুত্র পারের বাঙালিই শুধু নয়, আপামর উত্তর-পূর্বের বাঙালিদেরই সাহিত্য-সংস্কৃতি ক্ষেত্রে গুরুত্ব দেয় না পশ্চিমবঙ্গের মানুষ। চারপাশে অন্যভাষী, আতঙ্ক, ত্রাস—তবু ব্রহ্মপুত্র পারের বাঙালিরা কাব্যচর্চা করেছেন। আশির দশকে এমন একটা সময় গেছে প্রকাশ্যে বাংলা বলতে ভয় পেতেন বাঙালিরা। যদিও জয়ন্ত হাজরিকার[১৩৭] মতো কেউ কেউ অন্যরকম। পশ্চিমবঙ্গের বাঙালির কাছে লুইত পারের বাঙালির অন্তর্বেদনাকে সঞ্জয় ধরেছেন অমর 'আমি একা নির্জন ঘরে'[১৩৮] কবিতায়।

গঙ্গাপারের ছেলে মনের আনন্দে, খুল্লমখুল্লা, শোনে রবীন্দ্র[১৩৯]-দ্বিজেন[১৪০]-অতুল[১৪১]-নজরুল[১৪২]। আতঙ্ক-ত্রাসের লুইতপারে কোনও বাঙালির ঘরে উপর্যুক্ত গান বাজলে ধরে নিতে হবে ভুল হয়েছে—'আমার ঘরেও চুপে বাজেন, যখন করি ভুল।'

গঙ্গাপারের ছেলের মতো লুইতপারের ছেলেও বাংলায় খায়, বাংলায় শোয়, বাংলায় কাঁদে, বাংলায় হাসে। 'স্বপ্ন দেখা— সেও বাংলায়, বাংলায় ভালোবাসাবাসি'। তবে তফাত কোথায়? 'তফাত শুধু এইটুকু/তুমি বুক ফুলিয়ে পাড়ায়, পাড়ায়, ট্রামে-বাসের ভিড়ে/আমি একা, নির্জন বিষণ্ণ এক ঘরে'।

'ঈশানকোণ ডট্ কম্'[১৪৩] নামক এই কবিতায় সঞ্জয় আরও এরটা প্রশ্ন খুব নরম করে রেখেছেন— তোমাদের শুধুই একুশ, উনিশ কি নয়?

একুশ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলনের জন্য আগেই বিখ্যাত ছিল, রাষ্ট্রসংঘ একে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস'[১৪৪] হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে আরও মর্যাদামণ্ডিত করে তুলেছে। পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিরা কিন্তু মনেই রাখেন না যে ১৯ মে[১৪৫] বাংলাভাষার জন্য প্রাণ দিয়েছিলেন অসমেরই বাঙালি। যুগান্তর[১৪৬] পত্রিকার তৎকালীন সাংবাদিক অমিতাভ চৌধুরী[১৪৭] মর্মস্পর্শী ভাষায় সে বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। তবু এখনও অনেকেরই ধারণা, ওঃ ১৯ মে-র ঘটনাটা...ওটা তো ত্রিপুরায় হয়েছিল। তাঁদের জন্য সঞ্জয় লিখে রাখেন—

মাননীয় শ্রীমতী কুসুম, ত্রিপুরায় নয়,

শিলচরে হয়েছিল অমর সে-রক্তক্ষয়।

তবু দুই বাংলার বাঙালি ভাষাশহিদের কথা উঠলেই নুরুল-বরকতের[১৪৮] স্মরণ করেন, কমলারা উপেক্ষিতই থেকে যান। লুইতপারের পরিস্থিতি বড় সঠিকভাবে নিরূপণ করেছেন কবি—

আমরা যেখানে বসবাস করি,

প্রতিটি সকালে আমাদের বাধ্যতামূলকভাবে,

একটি শবদেহের গল্প শুনতে হয়।

এরকম চেতনাসঞ্জাত কবিতা দুই বাংলার কোনও কবির কলমে আসতে পারে না, সঞ্জয়-তপন তথা লুইতপারের বাঙালির স্বর তাই বেদনা-ত্রাস-আতঙ্কে ভরা।

গুয়াহাটিতে যেসব কবি বিস্ময়করভাগে অনালোচিত বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত যদি সেই তালিকার ঊর্ধ্বে থাকেন তবে সুব্রত চৌধুরীর[১৪৯] স্থান হবে দ্বিতীয়। অথচ নব্বইয়ের প্রথমদিকেই তিনি সম্পাদনা করেছেন কবিতা বিষয়ক ছোট কাগজে— পত্রপুট। এরপর ১৯৯৭ সালে তাঁর কবিতার বই, 'শব্দেরা সমবেত কবিতা'[১৫০], বেরিয়ে গেছে। এমনকি ব্রহ্মপুত্র পারের প্রায় সমস্ত পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ পেয়েছেন সুব্রত। সম্ভবত কোনও গোষ্ঠীর সঙ্গে থাকেননি বলেই কবিসমাজেও ব্রাত্য হয়ে রয়েছেন সুব্রত। অসম এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আকাশ-মাটি-গাছ-মানুষ-নদী-ফুলের কথা চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে সুব্রতর কবিতায়। এতটুকু বিস্ময় জাগে না যে তাঁর একটি কবিতার নামই 'ব্রহ্মপুত্র'। এবং পাশাপাশি তথ্য হিসেবে থেকে যাক, 'ব্রহ্মপুত্র' কবিতা দিয়েই 'শব্দেরা সমবেত কবিতা' বইটি শুরু হয়েছে। 'ক্রীসমাস ও শীতের সনেটগুচ্ছ'[১৫১]-তে মোহিত হওয়ার উপকরণ পাওয়া গিয়েছিল। সুব্রতের 'শীতের জন্য কয়েকটি স্তবক'[১৫২] জয় গোস্বামীর শীতের মতো নয়—

এবার শীত জাঁকিয়ে পড়েছে

জাটিংগা পাহাড়ে, কমলালেবু ভোর।

পাখিরহস্যের জন্য গোটা পৃথিবী নাম জানে জাটিংগার। আর বাঙালি কবিতা পাঠকের কাছে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের[১৫৩] 'জাটিঙ্গা' বিষয়ক কবিতাটি তো দারুণ 'হিট'। ভোরের সূর্যকে অনেকেই কমলালেবু বলেছেন কিন্তু অসমে এই উপমা হয়তো-বা আক্ষরিক অর্থেই কমলালেবুর প্রতি ব্যবহৃত। অর্থাৎ 'কমলালেবু ভোর' মোটেও উপমা নয়। রহস্য আছে বলেই না কবিতা। কয়েক পঙ্‌ক্তি পরেই পাওয়া যাচ্ছে—

গোলাপি আলোয় ভরেছে কমলালেবুর বাগান

কবিতার মধ্যে অনর্থক জটিলতা বা কৃত্রিমতা নেই সুব্রতের। যা বলার সোজাসাপ্টা লিখতে পছন্দ করেন। সে কোন পুরাণে জেনেছি, যজ্ঞের সময় কন্যা সতীর সামনে তাঁর স্বামী শিবের নিন্দা করেছিলেন যক্ষ। অভিমানে সতী আত্মঘাতী হন। ক্রোধে উন্মত্ত শিব স্ত্রীকে কাঁধে নিয়ে আবিশ্ব (নাকি আস্বর্গ) ঘুরতে থাকেন। শিবকে থামাতে বা ত্রিভুবন বাঁচাতে বিষ্ণুর চক্রে সতীর দেহ খণ্ড খণ্ড হয়ে পড়তে থাকে বিভিন্ন স্থানে। সতীর যোনি পড়েছিল যে স্থানে, আজ সেটাই বিখ্যাত শক্তিপীঠ— কামাখ্যা[১৫৪]। এবং কামাখ্যা মন্দির অবস্থিত নীলাচল পাহাড়ে। সুব্রত তাঁর 'নীলাচল' কবিতায় জানাচ্ছেন—

তুমি জল, অফুরান তৃষ্ণার জল

গৌরী নও, পাহাড়ি জলকন্যা

শ্যামলিকা এক নিবিড় কোল

মহামায়ার উদার ছায়া-আঁচল!

স্বপ্নের মতো যাপন! উন্মোদিনী

এক সৃজন বীজের দেওধ্বনি নাচ[১৫৫]!

লুইতপারের সাম্প্রতিক কবিদের মধ্যে অন্যতম শক্তিমান নিখিল তালুকদার[১৫৬] ইদানীং কবিতা খুব কম লিখছেন। তাঁর জীবনযাপনে কবিতা আর তেমন ধরা দিচ্ছে না। দিল্লিবাসী হয়ে যাওয়ায় কল্লোল প্রায় থেমে গেছেন, জীবিকার তাড়নায় নিখিলকে যেতে হয়েছে বরাক উপত্যকায়। এবং সবাক নিখিলকে আর পাওয়া যাচ্ছে না। নিখিলের একমাত্র কবিতাবই 'আয় বৃষ্টি জোট বাঁধি'[১৫৭]। নামেই পরিষ্কার হয়ে যায় যে নতুন ভাবনা নিয়ে আবির্ভাব ঘটছে কোনও কবির। কে আর বৃষ্টিকে জোট বাঁধার আহ্বান করেছে! নিখিলের কবিতায় বিভিন্নভাবে স্থানিক প্রভাব পড়েছে। এবং এই উপত্যকার বাইরে থেকে অসমে বসবাস নয়, নিখিল বরাবর ব্রহ্মপুত্রপারের বাসিন্দা। এজন্যই লেখেন—

'ঠিকানা আমার একটাই

মহাবাহু ব্রহ্মপুত্র।

লিখে নাও

যদি সময় পাও, এসো।' (তদেব, পৃ. ৩৭৯)

পশ্চিমবঙ্গে গিয়ে অনেকের মুখেই শুনতে হয়, ওখানে থাকা যায়? গোলমাল হচ্ছে না তো? এই অনুভূতি নিখিলকেও ছুঁয়ে গেছে—

'ওখানে ভালো থাকা যায়?'

জানতে চেয়েছে অনেকেই।

এরপর নিখিল নিজের উত্তর দেন—আমি তো ভালো আছি, ষোল আনা কুশল। এবং এটা শুধু নিখিলের উত্তর নয়, আমরা যারা ব্রহ্মপুত্র পারের বাঙালি, সবার কণ্ঠস্বর— আমরা ভালো আছি, ষোল আনা কুশলেই রয়েছি। আমাদের শরীর-মন-কোষে রয়েছে গভীরতা। সে গভীরতা ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে তুলনীয়, সোহাগে হয়ে ওঠে বহমান। সন্ত্রাস, জঙ্গিহানাও কি হয় না? হয়, 'মাঝে-মাঝে ফুঁসে ওঠা ঢেউয়ের পরও' আমরা ফের শুচি হয়ে যাই, পরস্পর।

নিখিলের ভাষায়—

শরীরের কোষে-কোষে ধরে রাখছি

মহাবাহুর গভীরতা, সে-গভীরতা

অমলিন সোহাগে কতখানি বহমান

এসে দেখে যেও

মাঝে-মাঝে ফুঁসে ওঠা ঢেউয়ের পরেও

আচমন-জলে আমরা কীভাবে শুচি হই পরস্পর।

শুধু অসমিয়া-বাঙালি নন, বোড়ো,[১৫৮] ডিমাসা,[১৫৯] কার্বি,[১৬০] মণিপুরি, নেপালি, বিহারি পাশাপাশি রয়েছেন ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায়। কখনো উত্তপ্ত হয়ে ওঠে কোকরাঝাড়, কখনো অশান্ত হয় কার্বি আংলং, কখনো দাঙ্গা হয় নগাঁও-বরপেটায়; কিন্তু আমাদের গভীরতা সেসব স্মৃতিকে অতলে তলিয়ে নিয়ে যায়, পরস্পর আমরা ফের বন্ধু হয়ে উঠি। এখানে 'পরস্পর' শব্দটি অনন্য অভিঘাত এনে দিয়েছে। মহাকবির সেই রচনা '...এক দেহে হল লীন'-এর মতো আমরাও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে গলাগলি করি, অমলিন সোহাগ করি। আর নিখিল এখানকার পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রশ্নকারী, সন্দেহ প্রকাশকারী বাঙালিকে জানান—

এসে দেখে যেও। আমাদের গলাগলি

সহিষ্ণু অবগাহন।

একটু আগেই দেখেছি একটি পঙ্‌ক্তির একেবারে শেষে 'পরস্পর' শব্দটি জুড়ে দিয়ে কবি কী অসম্ভব অভিঘাত সৃষ্টি করেছেন। আর এখানে সেই আবেশ ফিরে আসে অবগাহনের আগে 'সহিষ্ণু' শব্দটি প্রয়োগে। মহাবাহু ব্রহ্মপুত্রের জলে আমরা আচমন করে শুচি হই, অবগাহন করি। পরস্পরকে সোহাগ করি, তারপরও একটা বোধ জেগে থাকে—আমরা সবাই সহিষ্ণু। ছেলে ভুলে যায় তারা বাবা কাদের হাতে প্রাণ হারিয়েছিল, স্ত্রী ভুলে যান কারা তাঁকে ধর্ষণ করেছিল ; আমরা সহিষ্ণু হয়ে উঠি। এবং সেটাই আমাদের ঠিকানা। গোটা বিশ্বের কাছে কবির উদাত্ত আহ্বান—

এসো কিন্তু, ঠিকানা আমরা একটাই।

কয়েক বছর আগে খবরের কাগজের প্রথম পাতায় নিয়মিত স্থান করে নিয়েছিল বোড়োভূমি। এতই উত্তপ্ত ছিল সেখানকার পরিস্থিতি। অন্যের মুখে শোনা নয়, কোনও গবেষণা থেকে পাঠ নয়, অশান্ত সময়ের জীবন্ত সাক্ষী নিখিল। তাঁর মননে দাঙ্গা-সন্ত্রাস-জঙ্গি ছাপ রেখে যায়।

অসুস্থ মা আর বৃদ্ধ বাবাকে একা রেখে

বছর পঁচিশের যে-ছেলেটি বন্দুক উঁচিয়ে

রাগে-অভিমানে বনেবাদাড়ে, ভুল পথে

ঘুরে বেড়াচ্ছে, সে আমার মায়ের পেটের ভাই

অথবা ভাইয়ের বন্ধু।

ক্রিকেটের ভাষায় বলতে গেলে—অভিজিৎ চক্রবর্তী[১৬১] চুটিয়ে খেলেছেন ২০০০-২০০৪। গুয়াহাটিতে তখন তিন তরুণ তুর্কিকে[১৬২] প্রায় সব আড্ডায় একসঙ্গে দেখা যেত। বলে দিতে হয় না যে এর মধ্যে একজন অবশ্যই অভিজিৎ।

'সাংসুমা বসুমতারির চিত্রকর্ম'[১৬৩] কবিতা এভাবেই শুরু করেছেন কবি। পঞ্চাশের দশকে খুব সাবলীলভাবে 'বরদৈচিলা' শব্দ ব্যবহার করেছেন অমলেন্দু গুহ। এখন অভিজিৎ তাতে শিল্প মেশাচ্ছেন। অসমের রুক্ষ

ভূমির স্বাভাবিক উদ্ভিদ এরন্ডা[১৬৪]। এবং কবি লেখেন—

বুঝে আছে একমুঠো এরন্ডার পাতা

তাতে কিছু গোবেচারা পলু। কুঁড়ে খাচ্ছে—

এরন্ডা গাছে একধরনের পোকা হয়— পলু[১৬৫]। বসুমতারি পদবি থাকলেই বুঝে নেওয়া যায় যে এই ব্যক্তি বোড়ো উপজাতির অন্তর্ভুক্ত। এবং বোড়োদের মধ্যে সাংসুমা অত্যন্ত পরিচিত নাম। কয়েক বছর আগে প্রায় প্রতিদিনই প্রথম পাতায় থাকত অশান্ত বোড়োল্যান্ডের গল্প।

সমাগত বৈশাগুর দিনে

দয়িত দূরে ছিল বুঝি?

—অতি দূর, রাষ্ট্র ছাড়িয়ে

বোড়োদের এক উৎসবের নাম বৈশাগু[১৬৬]। অশান্ত বোড়োভূমিতে অনেকেই থাকতে পারেননি, রাষ্ট্র ছাড়িয়ে চলে যেতে হয়েছে অনন্ত শয়নে।

দখনায় সবুজের বাড়াবাড়ি ভিড়

একরাশ পলুদের অনর্গল খিদে

তাঁতশালে সাংসুমা একা একা

কী স্বপ্ন বুনেছিলে তুমি?

বোড়ো জনজাতির মেয়েরা দখনা[১৬৭] পরিধান করে। এবং সেটা এখনও নিজেদের ঘরেই তৈরি হয়। এখানে দয়িত চলে গেছে রাষ্ট্র থেকে দূরে। তাঁতশালে সাংসুমা বসুমতারি একা একা স্বপ্ন বুনে যায়। নারীহারা, দয়িতহারা এক প্রেমিক। তাঁর কান্না, তাঁর অভিমান, তাঁর অনুরাগ ঝরে পড়ে এরন্ডার পাতায়। এবং কবির অনিবার্য প্রশ্ন—

কত অশ্রু সবুজে মেশালে

এমন হরিদ্রাভ হয় এরন্ডার পাতা?

ইদানীং অভিজিৎ চক্রবর্তীর কলমে স্থানিক বৈশিষ্ট্য আনমনে ধরা পড়ছে।

বিগত বন্যায় যারা খুইয়েছে ভিটেমাটি সব

সেইসব উপজাতি গ্রামে ঘোলাজলে মাছ উৎসব

আগের কবিতায় পেয়েছি সাংসুমা বসুমতারি, বৈশাগু, দখনার মতো টিপিক্যাল বোড়ো শব্দ। এখানে বন্যায় ভিটেমাটি খুইয়েছে উপজাতিরা। অনিবার্য, তা হবে বোড়ো। আবার অসমের বাংলাদেশি সমস্যা ছুঁয়ে গেছে কবির মন। নামহীন পঙ্‌ক্তিমালায় তিনি লিখেছেন—

সেই মেয়ে, যে তার পচা ভাদ্রে এনেছে পৌষের আলো

যাকে তার কিশোর সাইকেল রডে নিয়ে ঘোরায় নিয়ত

ভোরের স্বপ্নে সে আগে আর পি-আর-সি দেখতে চায়

খুব সচেতনভাবে মেয়ের পরিচয়ে 'পচা ভাদ্রে'-র উল্লেখ করেন কবি। গ্রামের মেয়ে, নিশ্চয় কিশোরী, এজন্যই তার কিশোর, তার প্রেমিক সাইকেলের রডে ঘোরায় প্রতিনিয়ত। প্রতিনিয়ত এখানে প্রেম। পি-আর-সি[১৬৮] হল পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট সার্টিফিকেট। এটি থাকলেই মোটামুটি নিজেকে ভারতবাসী প্রমাণ করা যাবে। অন্তত এখানে, লুইতপারে। 'স্বপ্ন যে ভেঙে যায়, না-বললেও চলে।'

সে বিষণ্ণ হেঁটে যায় শসা খেত ধরে

দূরে উঁচু জমি, সারিবদ্ধ বেগুনের গাছ

দুদিকে ছড়ানো কাঁটা, তার পাশে শক্ত দুই পা

উবু হয়ে, ফলন্ত বেগুনের সাথে কথা বলছে যেন

বৃদ্ধ এক, কিশোরের পিতার জনক

বেগুন গাছের কাঁটার পাশে ওই বৃদ্ধ, মাটিতে মন দেওয়া বৃদ্ধ সাবলীল হেঁটে যান শক্ত দুই পায়ে। ফলন্ত বেগুনকে দেখেন সন্তানস্নেহে। উবু হয়ে বসেন, কথা বলেন, আদর করেন নিজের ফসলকে। কিন্তু সেই স্বপ্ন যে ভেঙে যায় তা না-বললেও চলে।

কোনো সম্ভাষণ নয়, কণ্ঠস্বর নিবাত গম্ভীর

একটি প্রশ্ন শুধু সংক্ষিপ্ত প্রখর—

বলো, তুমি বাংলাদেশি কি না?

এই প্রশ্ন বেশ কয়েক দশক ধরে লুইতপারের বাঙালিকে কুঁড়ে কুঁড়ে খাচ্ছে। এই প্রশ্নের সম্মুখীন হতে চায় না কেউ। তাই—

এই প্রশ্নে পোকা লাগে বেগুনের গাছে

মেঘ জমে অঘ্রানের মাথার উপর

তিনি শুধু নিরুত্তর, উবু হয়ে—

দুদিকে ছড়ানো কাঁটা, তার পাশে দুই শক্ত পা

আসলে এটা কোনও অঘ্রানের গল্প নয়, নয় গল্প বেগুনের খেতের। দুদিকে ছড়ানো কাঁটা। এবং এই কাঁটা আসলে কাঁটাতারের বেড়া। তাই দুই পাশে দুই শক্ত পা। এক পা বাংলাদেশে, এক পা ভারতে। কেননা এরপর কবি আর কোনও প্রশ্ন রাখেননি, খুব পরিষ্কার করে সিদ্ধান্ত ঘোষণার মতো, শেষ সত্য জানিয়েছেন—

তাঁরও যে বন্ধু ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ[১৬৯]

## তথ্যসূত্র

১. লুইত পার — ব্রহ্মপুত্রের আরেক নাম লুইত। লুইতের পারের কথাই বলা হয়েছে।

২. অমলেন্দু গুহ— অসমের অন্যতম কবি। যাঁর একমাত্র বাংলা কাব্যগ্রন্থ 'লুইত পারের গাথা'কে অসমের প্রথম সার্থক বাংলা কাব্যগ্রন্থ বলা হয়।

৩. লুইত— ব্রহ্মপুত্র নদ।

৪. শিপিনী— যাঁরা তাঁতশালে কাপড় বোনেন।

৫. রিহামেখলা— রিহা একধরনের ছোট চাদর। যা আগে বিহু নাচে মেয়েরা মেখলার ওপর পরত। তবে বর্তমানে কেবল বিয়ের সময়ই এই রিহা চাদর পরিধান করে অসমিয়া মহিলারা।

৬. বহাগী— বৈশাখ মাসে পালিত উৎসব।

৭. নাহর— এক জাতীয় বিশেষ গাছ, যার ফুল ফোটে বৈশাখ মাসে এবং বিহু উৎসবের একটি অঙ্গ।

৮. ভৈয়াম— মাটির সমতল অংশকে অসমিয়া ভাষায় ভৈয়াম বলে।

৯. কপৌ — এক জাতীয় ফুল, যা বৈশাখ মাসে রঙালি বিহুর সময় ফোটে এবং বিহু নাচনীদের খোঁপায় গাঁথা হয়।

১০. বিষ্ণু দে— বাংলার আধুনিক কাব্যধারার একজন অন্যতম কবি।

১১. কমলকুমার— কমলকুমার মজুমদার, বাংলাভাষার অন্যতম একজন সাহিত্যিক।

১২. জীবনানন্দ দাস— বাংলার আধুনিক কাব্যধারার অনন্য কবি। যাঁর 'বনলতা সেন' কাব্যগ্রন্থটির এখন প্রায় 'মিথ'-এ পরিণত হয়েছে।

১৩. কমলা— কমলা এক ধরনের ফল।

১৪. কমলার কুঞ্জে— অমলেন্দু গুহর কবিতার লাইন।

১৫. বিহু— অসমের জাতীয় উৎসব। বিহু তিনপ্রকার— বহাগ বিহু, কাতি বিহু ও মাঘ বিহু।

১৬. আনকোরা রিহামেখলা— নতুন বস্ত্র, যা বিহুর সময় পরিধান করা হয়।

১৭. বহাগীর আমন্ত্রণ— বহাগ বিহুর সময় প্রকৃতির যে হৃদয় খোলা আমন্ত্রণ।

১৮. কলঙের জলোচ্ছ্বাস— কলঙ অসমের একটি নদী। তারই জলোচ্ছ্বাসের কথা কবি উল্লেখ করেছেন।

১৯. জুমখেত— এই ধরনের খেতটি বস্তুত অসম তথা উত্তর-পূর্বাঞ্চলেই দেখা যায়। এর বৈশিষ্ট্য হল প্রথমে মাটি পুড়িয়ে প্রত্যেক ধাপে-ধাপে এই খেতটি করা হয়।

২০. ভৈয়ামের ভিজে মাটি— সমতলের ভিজে মাটির কথা বলা হয়েছে।

২১. লুইতের গতিবেগ— লুইত অর্থাৎ ব্রহ্মপুত্র নদের গতি।

২২. শান্তির নিবিড় নীড়— অমলেন্দু গুহর কবিতার পঙ্‌ক্তি।

২৩. ঢেঁকিতে মেয়েদের ধান ভানা— অসমের গ্রামে বহাগ ও মাঘ বিহুর সময় ঢেঁকিতে মেয়েদের ধান কোটার চিত্রের কথা বর্ণনা করা হয়েছে।

২৪. ফার্স্ট লাভ— ওয়াসিম পপকঙ পরিচালিত থাইল্যান্ডের ফিল্‌ম।

২৫. দৃঢ়ঊরু মেয়েদের পদপাতে নেচে ওঠে ঢেঁকি— অমলেন্দু গুহর 'বিহু' কবিতার পঙ্‌ক্তি।

২৬. ভোগালি বিহু— মাঘ মাসে পালিত বিহুকে ভোগালি বিহু বলা হয়।

২৭. বহাগ বিহু— বৈশাখ মাসে পালিত বিহুকে বহাগ বিহু বলা হয়।

২৮. বীরেন্দ্রনাথ— বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত। পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা, কর্মসূত্রে প্রথম শিলঙে এবং পরে

গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন। কবি।

২৯. সুধীন্দ্রনাথ— বাংলাভাষার অন্যতম কবি।

৩০. যতীন্দ্রনাথ— যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, বাংলা সাহিত্যের অন্যতম কবি।

৩১. মোহিতলাল— মোহিতলাল মজুমদার, বাংলা সাহিত্যের গীতিকাব্যের ধারার কবি।

৩২. কল্লোল — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বেঁচে থাকতে অন্যধারার কবিদের কল্লোল যুগের কবি বলে অভিহিত করা হয়েছে।

৩৩. কৃত্তিবাস— সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, দীপক মজুমদার, আনন্দ বাগচী প্রকাশিত পত্রিকা।

৩৪. হাংরি আন্দোলন— মলয় রায়চৌধুরীর নেতৃত্বে পূর্ব ভারতে গত শতকের ষাটের দশকের সাহিত্য আন্দোলন।

৩৫. মলয় রায়চৌধুরী— বিখ্যাত কবি, গদ্যকার। 'প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক ছুতার' কবিতাটি লেখার জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন।

৩৬. ১৯৬২-৬৪— হাংরি আন্দোলনের সলতে পাকানোর পর্ব।

৩৭. শঙ্খ— শঙ্খ ঘোষ বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান কবি।

৩৮. অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত— কৃত্তিবাস পর্বের কবি, জার্মানিতে অধ্যাপনা করেন।

৩৯. আট বছর আগের একদিন— জীবনানন্দ দাশের বিখ্যাত কবিতা।

৪০. তিনশো বছর আগে— বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিতের একটি কবিতার নাম।

৪১. চিঠি— বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিতের একটি কবিতার নাম।

৪২. চেরাপুঞ্জি— মেঘালয়ের একটি পর্যটন কেন্দ্র। সেখানে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত হয়।

৪৩. শিলং— মেঘালয়ের রাজধানী। উল্লেখ্য অবিভক্ত অসমেরও রাজধানী ছিল শিলং।

৪৪. উঠছে পাইনবন গুনগুনিয়ে; — কবিতার পঙ্‌ক্তি।

৪৫. রডোডেনড্রন— এক ধরনের উদ্ভিদ। উল্লেখ্য পাইন বন ও রডোডেনড্রন দুটি গাছের নাম। যা মূলত শিলং-এর দিকেই দেখা যায়।

৪৬, 'স্মৃত— বিস্মৃত-রক্তিম'— বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিতের কবিতার পঙ্‌ক্তি।

৪৭. ঊর্ধ্বেন্দু দাশ— ষাটের দশকে অসমের বাঙালি কবিদের মধ্যে অন্যতম প্রধান কবি।

৪৮. উজান অসম— অসমের উত্তর-পূর্ব দিককে বলা হয় উজান অসম।

৪৯. সংবর্ত— একটি ছোট পত্রিকা। ঊর্ধ্বেন্দু দাসের সম্পাদনায় ষাটের দশকে প্রকাশিত।

৫০. মজলিস— একটি ছোট পত্রিকা। ঊর্ধ্বেন্দু দাসের সম্পাদনায় ষাটের দশকে প্রকাশিত।

৫১. বিষণ্ণ পরবাস, নির্বাসন নয়— ঊর্ধ্বেন্দু দাসের একটি কবিতার নাম। যেখানে বাস্তুভিটে হারা কবি নতুন জায়গায় এসে বিষণ্ণতা অনুভব করেছেন।

৫২. ঘরে তার ফেরা বা না-ফেরা— ঊর্ধ্বেন্দু দাসের কবিতা-বইয়ের নাম।

৫৩. এই লজ্জা তোমার আমার— ঊর্ধ্বেন্দু দাসের কবিতা-বইয়ের নাম।

৫৪. আবার আসিব ফিরে— জীবনানন্দের কবিতার নাম।

৫৫. ৬ ডিসেম্বর ; ১৯৯২— বাবরি মসজিদ ধ্বংসের তারিখ।

৫৬. ১৯৮০— অসমে বহুচর্চিত 'বঙাল খেদা' আন্দোলন সূচনার কাল।

৫৭. নকশাল আমল— পশ্চিমবঙ্গের অতি বামপন্থী আন্দোলনের সময়পর্ব।

৫৮. জিনেদিন জিদান— ১৯৯৭ বিশ্বকাপ জয়ী ফ্রান্সের সেরা ফুটবলার।

৫৯. সাকিন আসাম, ১৯৮৩— ঊর্ধ্বেন্দু দাসের একটি কবিতার নাম। যা উত্তর-পূর্বের বাংলা কবিতা সংকলনে প্রকাশিত হয়েছে।

৬০. দাঙ্গার প্রতিবেদন— দেবেশ রায়ের একটি উপন্যাস।

৬১. কপিলি— অসমের একটি নদীর নাম।

৬২. কলং— অসমের একটি নদীর নাম।

৬৩. দিখৌ— অসমের একটি নদীর নাম।

৬৪. নতুন মাতৃভূমি — ক্ষিতীশ রায়ের একটি কবিতার নাম।

৬৫. খিলঞ্জিয়া— 'খিলঞ্জিয়া' শব্দের অর্থ হল ভূমিপুত্র।

৬৬. শ্রমী বনুয়া— কুলি শ্রমিক।

৬৭. বিহুরানি— বিহু উৎসবের মনোনীত রানি।

৬৮. পদ্মা মেঘনা— বাংলাদেশের দুটি নদীর নাম।

৬৯. সকলের তরে অবারিত দ্বার চিত্ত অসংশয়— ক্ষিতীশ রায়ের একটি কবিতার পঙ্‌ক্তি।

৭০. চেনেহী— অসমিয়াতে প্রেমিকাকে চেনেহী বলে।

৭১. মরমর— আদরের বা ভালোবাসার বোঝাতে 'মরমর' শব্দটি অসমিয়া ভাষায় ব্যবহার করা হয়।

৭২. অমৃতকুম্ভের সন্ধানে— সমরেশ বসুর লেখা ভ্রমণকাহিনির নাম।

৭৩. কালকূট— সমরেশ বসুর ছদ্মনাম।

৭৪. শাশ্বতী সমা— কবি জীবন নাথের কাব্যগ্রন্থের নাম।

৭৫. মা নিষাদ— জীবননাথের কাব্যগ্রন্থের নাম।

৭৬. পুষ্পমোচনের উদ্ভিন্ন রাগে— জীবন নাথের কাব্যগ্রন্থের নাম।

৭৭. ব্রহ্মপুত্রে ভাসমান ভেলা— জীবন নাথ সম্পাদিত লিটল ম্যাগাজিন।

৭৮. জয় গোস্বামী— বাংলাভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি।

৭৯. লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া— অসমিয়া ভাষার কিংবদন্তিপ্রতিম সাহিত্যিক। যাঁকে নিয়ে জীবন পাথ 'পুষ্পমোচনের উদ্ভিন্ন রাগে' রচনা করেছেন।

৮০. ঈশানের কোণে লৌহিত্য পারে— বরাক উপত্যকার অপর নাম ঈশান কোণ। এবং ব্রহ্মপুত্রের অপর নাম লৌহিত্য বলা হয়েছে।

৮১. বরপেটা— ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার একটি জেলা।

৮২. বাণাসুর— পুরাণের কথিত অসমের একটি চরিত্র বাণাসুর। কথিত আছে বাণাসুরের কন্যা উষা শ্রীকৃষ্ণের নাতি অনিরুদ্ধের সঙ্গে প্রেমবন্ধনে আবদ্ধ হয়। যা বাণাসুর গ্রহণ করতে পারেনি। বাণাসুর শিবের ভক্ত ছিলেন। এবং তিনি শিবের প্রার্থনা করেছিলেন যেন কৃষ্ণকে বধ করতে পারেন, ফলে পুরাণ কথিত বিখ্যাত হরি-হরের যুদ্ধ হয়েছিল।

৮৩. ভাওনা রসিক— লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়াকে ভাওনা-রসিক বলা হয়।

৮৪. মদনমোহনের শিশুশিক্ষা— মদনমোহন তর্কালঙ্কারের প্রবন্ধের নাম।

৮৫. অসম বুরঞ্জিবিদ বিখ্যাত কালীনাথ— কালীনাথ অসমের বিখ্যাত ইতিহাসবিদ।

৮৬. অশ্বক্লান্ত— অসমের ব্রহ্মপুত্র নদের উপরে একটি দ্বীপ যা একটি তীর্থস্থান। কথিত আছে অর্জুনের অশ্ব এখানে এসে ক্লান্ত হয়ে বিশ্রাম নিয়েছিল। সেজন্য এই স্থানটিকে অশ্বক্লান্ত বলা হয়।

৮৭. উমানন্দ— ব্রহ্মপুত্র নদের একটি দ্বীপ। পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম নদীদ্বীপ। তীর্থস্থান। যেখানে শিবমূর্তি প্রতিষ্ঠিত।

৮৮. ঊর্বশী— পুরাণে কথিত স্বর্গের সবচেয়ে নামী অপ্সরা।

৮৯. মরিয়নি— উজান অসমের একটি জায়গার নাম।

৯০. সত্যেন চৌধুরী— মরিয়নির অধ্যাপক-কবি। অসমিয়া কবি দুর্গা হাজরিকার সঙ্গে যৌথভাবে 'সাঁকো' নামে একটি কবিতা-বই প্রকাশ করেছিলেন ১৯৭১ সালে।

৯১. দুর্গা হাজরিকা— অসমের বিখ্যাত কবি।

৯২. সাঁকো— সত্যেন চৌধুরী ও অসমিয়া কবি দুর্গা হাজরিকার কবিতা-বই ।

৯৩. মায়ের চিঠি— সত্যেন চৌধুরীর কবিতা।

৯৪. ভোগদৈ— উজান অসমের একটি নদী।

৯৫. রবীন্দ্র সরকার— অসমের বাংলা কবিতার একজন সফল কবি। পাশাপাশি লিখেছেন অসমিয়া কবিতাও। অসমিয়া কাব্যগ্রন্থ 'ধূলিওরি ভরির ছাঁ'।

৯৬. কেকারু বর্মণ মুখোশের পর মুখোশ বানায়— রবীন্দ্র সরকারের কবিতার পঙ্‌ক্তি।

৯৭. তিস্তাপারের বৃত্তান্ত— দেবেশ রায়ের উপন্যাস।

৯৮. বাঘারু— দেবেশ রায়ের 'তিস্তা পারের বৃত্তান্তের' একটি চরিত্র।

৯৯. মহাশ্বেতা দেবী— বাংলার অন্যতম ঔপন্যাসিক। যিনি মূলত আদিবাসীদের নিয়ে উপন্যাস লিখেছেন।

১০০. নাজিম হিকমত— তুরস্কের প্রবাদপ্রতিম কবি।

১০১. অনেক দিনের ঈশ্বর— কবি প্রমোদরঞ্জন সাহার কবিতা-পঙ্‌ক্তি।

১০২. গভীর উৎসব— এখানে গভীর উৎসব বলতে বিহুকে বোঝানো হয়েছে।

১০৩. মানসে পিকনিক সেরে— জীবন নাথের 'গভীর উৎসব' কবিতার লাইন। মানস অসমের একটি বিখ্যাত অভয়ারণ্য।

১০৪. বুদ্ধদেব গুহ— বাংলা সাহিত্যের একজন অন্যতম সাহিত্যিক।

১০৫. মাধুকরী— বুদ্ধদেব গুহর উপন্যাস।

১০৬. শীর্ষেন্দু মুখোপাদ্যায়— বাংলাভাষার অন্যতম গল্পকার ও ঔপন্যাসিক।

১০৭. সত্যি ব্রহ্মপুত্র হৃদয় ছড়াতে জানে— ব্রহ্মপুত্রের পারে অসমিয়া ও বাঙালি ছাড়াও বিভিন্ন জাতি উপজাতির মানুষ বসবাস করে। ব্রহ্মপুত্র কিন্তু এদের কাউকেই উপেক্ষা করেনি, সকলকেই নিজের হৃদয়ে আপন করে নিয়েছে। এখানে ব্রহ্মপুত্র বলতে আসলে অসমের প্রকৃতিকে বোঝানো হয়েছে।

১০৮. পদ্মা মেঘনার আদর— বাস্তু ভিটে হারা বাংলাদেশ ছেড়ে আসা মানুষের শিরা উপশিরায় এই পদ্মা মেঘনার জলের ভালোবাসার স্নেহধারা প্রবাহমান।

১০৯. বরদৈচিলা— বাঙালিদের যেমন দুর্গাপূজার সময় বলা হয়, মা দুর্গা বাপের বাড়ি আসেন তেমনি বৈশাখ মাসে কালবৈশাখীর যে ঝড় উঠে অসমিয়া লোকেদের বিশ্বাস যে কালবৈশাখীর এই ঝড়

নিয়ে আসে বরদৈচিলা মায়ের বাড়িতে। তাই তারা বলে কালবৈশাখীর এই ঝড়কে 'বরদৈচিলা মাকর ঘরলৈ আহিছে'।

১১০. বিহুকুমারী— যারা বিহু নাচে তাদের বিহুকুমারী বলা হয়েছে।

১১১. কাজিরঙা— অসমের অন্যতম অভয়ারণ্য। যেখানের এক খড়গ বিশিষ্ট গন্ডার পৃথিবী বিখ্যাত।

১১২. শিলং— অজিত কুমার দত্তের একটি কবিতার নাম।

১১৩. দেবীপ্রসাদ— দেবীপ্রসাদ সিংহ, অসমের একজন বিশিষ্ট কবি ও গল্পকার। আটের দশকে কিছু কবিতাও লিখেছেন।

১১৪. মৃদুলকান্তি দে— কবি, গল্পকার।

১১৫. কিশোর ভট্টাচার্য— ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার শক্তিমান কবি।

১১৬. বিহুগীত— বিহুর সময় যে গান গাওয়া হয় তাকে বিহুগীত বলা হয়।

১১৭. পেঁপা— বন্য মোষের শিং দিয়ে তৈরি এই বাঁশি বহাগ বিহুর সময় বাজানো হয়। বাঁশিটির বিশেষত্বই এই যে এটি যৌন আবেদন সৃষ্টি করে তার সুরের মধ্যে।

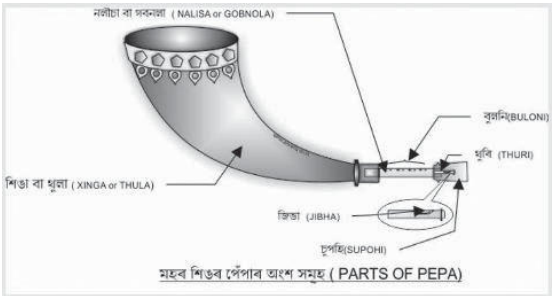


১১৮. সনন্ত তাঁতি— অসমের একজন বিখ্যাত কবি। যদিও অসমিয়া ভাষাতে কবিতা লিখেছেন কিন্তু তিনি মূলত চা জনগোষ্ঠীর অন্তর্গত।

১১৯. সমীর তাঁতি— অসমের একজন বিখ্যাত কবি। যদিও অসমিয়া ভাষাতে কবিতা লিখেছেন কিন্তু তিনি মূলত চা-জনগোষ্ঠীর অন্তর্গত। তাঁর একটি কবিতা বাংলায় অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে 'সমীর তাঁতির কবিতা' নামে। প্রকাশক 'নাইন্‌থ কলাম।'

১২০. হামদের কথা বাবুরা বলেন— সনন্ত তাঁতির কবিতার লাইন। এইভাষাটি চা-জনগোষ্ঠীর ভাষা।

১২১. তপন মহন্ত— ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার একজন বিশিষ্ট কবি।

১২২. অন্ধকারে পৌর্ণমাসী— তপন মহন্তের কাব্যগ্রন্থের নাম।

১২৩. সঞ্জয় চক্রবর্তী— ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার নব্বইয়ের দশকের অন্যতম কবি।

১২৪. মহাবাহু— সঞ্জয় চক্রবর্তীর সম্পাদিত ছোট পত্রিকা।

১২৫. তপন রায়— ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার অন্যতম শক্তিমান কবি। বর্তমানে থাকেন উত্তরবঙ্গে।

১২৬. ঈশ্বরচন্দ্র— এখানে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কথা বলা হয়েছে। যিনি নারী শিক্ষার জন্য স্মরণীয়।

১২৭. জুবিন— অসমের প্রখ্যাত গায়ক জুবিন গার্গ।

১২৮. বরগীত— অসমের মহাপুরুষ শংকরদেবের রচিত গীত। যে গীতকে পরবর্তীতে সার্থকভাবে এগিয়ে নিয়ে গেছিলেন তাঁরই শিষ্য মাধবদেব।

১২৯. দামোদর— পশ্চিমবঙ্গের একটি নদের নাম।

১৩০. বব ডিলান— বিখ্যাত মার্কিন গায়ক। নোবেল পুরস্কারে ভূষিত।

১৩১. সাকরি কামং— মিসিং জনজাতীয় গান।

১৩২. বাগরুম্বার মাদল— বাগরুম্বা বোড়ো জনজাতির একটি বিশেষ গান। যার সঙ্গে একটি বিশেষ ভঙ্গিমায় তারা নৃত্য করে এবং মাদল বা ঢোল বাজায়।

১৩৩. নচিকেতার বৃদ্ধাশ্রম— নচিকেতা চক্রবর্তী, বাংলা জীবনমুখী গানের জনপ্রিয় গায়ক। যাঁর বৃদ্ধাশ্রম গানটি অসমিয়া-বাঙালি সকলের কাছে খুবই পরিচিত।

১৩৪. সুমনের দশ ফুট বাই দশ ফুট— কবির সুমন নামে তিনি খ্যাত, যাঁর 'দশ ফুট বাই দশ ফুট' একটি পরিচিত গান।

১৩৫. শোণিতপুরে রক্তকরবী— সঞ্জয় চক্রবর্তীর একটি কবিতার নাম।

১৩৬. বাবা— সঞ্জয় চক্রবর্তী একটি কবিতার নাম। যা প্রায় লোককথায় পরিণত হয়েছে।

১৩৭. জয়ন্ত হাজরিকা— ভূপেন হাজরিকার ভাই, তিনি নিজেও ছিলেন অসমের শক্তিমান গায়ক। উল্লেখ্য যে তিনি পশ্চিমবঙ্গের কন্যা মনীষাকে বিয়ে করে অসমিয়া-বাঙালি সম্পর্ককে আরও মজবুত করেছেন।

১৩৮. আমি একা নির্জন ঘরে— সঞ্জয় চক্রবর্তীর কবিতার নাম। যেখানে লুইত পারের বাঙালির অন্তর্বেদনা ফুটে উঠেছে।

১৩৯. রবীন্দ্র— বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১৪০. দ্বিজেন— কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

১৪১. অতুল— কবি অতুলপ্রসাদ সেন।

১৪২. নজরুল— বিদ্রোহী কবি হিসাবে বাংলা সাহিত্যে খ্যাত কাজী নজরুল ইসলাম।

১৪৩. ঈশান কোণ ডট্ কম্— সঞ্জয় চক্রবর্তীর একটি কবিতার নাম।

১৪৪. আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস— ২১শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস বলে স্বীকৃতি দিয়েছে ইউনেস্কো।

১৪৫. ১৯ মে— ১৯৬১ সালের এই দিনটিতে বাংলাভাষা রক্ষার দাবিতে আন্দোলনরত ১১জন ভাষাপ্রেমীকে রাষ্ট্র হত্যা করে।

১৪৬. যুগান্তর পত্রিকা— কলকাতা থেকে প্রকাশিত একটি পত্রিকার নাম, অধুনা বিলুপ্ত।

১৪৭. অমিতাভ চৌধুরী— বাংলা সাংবাদিকতার প্রবাদপ্রতিম ব্যক্তিত্ব।

১৪৮. নুরুল-বরকত— বাংলাদেশের বিখ্যাত একুশে ফেব্রুয়ারি ভাষা শহিদদের অন্যতম দুজনের নাম।

১৪৯. সুব্রত চৌধুরী— ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার অন্যতম কবি। তিনি সম্পাদনা করতেন 'পত্রপুট' নামের ছোট পত্রিকা।

১৫০. শব্দের সমবেত কবিতা— সুব্রত চৌধুরীর কবিতা-বই।

১৫১. ক্রীসমাস ও শীতের সনেটগুচ্ছ— জয় গোস্বামীর প্রথম কাব্যগ্রন্থ।

১৫২. শীতের জন্য কয়েকটি স্তবক— সুব্রত চৌধুরীর একটি কবিতার নাম।

১৫৩. সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়— বাংলাভাষার অন্যতম প্রধান সাহিত্যিক।

১৫৪. শক্তিপীঠ কামাখ্যা— নীলাচল পাহাড়ে অবস্থিত অসমের একটি বিখ্যাত শক্তিপীঠ কামাখ্যা।

কথিত আছে এখানে নাকি সতীর যৌনাঙ্গ পড়েছিল।

১৫৫. দেওধ্বনি নাচ— কামাখ্যায় একটি বিশেষ সময়ে দেওধ্বনি উৎসব হয়। সেই সময় শিঙা বাজিয়ে, বলির রক্ত খেয়ে নাচ করেন ভক্তরা। তাকেই দেওধ্বনি নৃত্য বলে। এই নৃত্য কেবল কামাখ্যাতেই হয়।

১৫৬. নিখিল তালুকদার— ব্রহ্মপুত্র পারের একজন বিশিষ্ট কবি।

১৫৭. আয় বৃষ্টি জোট বাঁধি— নিখিল তালুকদারের প্রথম কাব্যগ্রন্থ।

১৫৮. বোড়ো— অসমের এক অন্যতম জনজাতি।

১৫৯. ডিমাসা— অসমের জনজাতি।

১৬০. কার্বি— অসমের কার্বি-আংলং জেলার উপজাতি।

১৬১. অভিজিৎ চক্রবর্তী— অসমের একজন অন্যতম কবি। বর্তমানে টংলা কলেজে অধ্যাপনা করেন।

১৬২. তিন তরুণ তুর্কি— গুয়াহাটির এই তিন তরুণ তুর্কি হলেন ড. প্রসূন বর্মন, ড. সৌমেন ভারতীয়া ও ড. অভিজিৎ চক্রবর্তী। এঁরা একসঙ্গে সম্পাদনা করতেন লিটল ম্যাগাজিন 'নাইন্‌থ কলাম'।

১৬৩. সাংসুমা বসুমতারির চিত্রকর্ম— অভিজিৎ চক্রবর্তীর কবিতার লাইন।

১৬৪. এরণ্ডা—অসমের রুক্ষভূমির এক ধরনের উদ্ভিদ।

১৬৫. পলু— এরণ্ডা গাছে একধরনের পোকা হয় তাকে 'পলু' বলে।

১৬৬. বৈশাগু— বৈশাখ মাসে পালিত বোড়ো জনজাতীয় উৎসব।

১৬৭. দখনা— বোড়োদের পরিধেয় বস্ত্র।

১৬৮. পি-আর-সি— পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট সার্টিফিকেট। এটি থাকলেই ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় নিজেকে ভারতবাসী বলে প্রমাণ করা যায়।

১৬৯. বঙ্গবন্ধু শেখ— শেখ মুজিবুর রহমানের কথা বলা হয়েছে।